ভূত-রহস্য

আনন্দ বাগচী

নিশা পাবলিশিং
শ্রীরামপুর, হুগলী

উৎসর্গ

শ্রীবিশ্বজিৎ গোস্বামী

সুহৃদবরেষু

প্রথম প্রকাশ

অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৭০

প্রকাশিকা—শ্রীমতী নিশা রায়

নিশা পাবলিশিং

শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রচ্ছদপট—সুব্রত কুমার রায়

শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রচ্ছদ ব্লক করেছেন :

এস্ কুমার, টালিগঞ্জ, কলিকাতা

মুদ্রণে—সরযূ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বটতলা, শ্রীরামপুর, হুগলী

চন্দ্রিমা চক্রবর্তী

রুমা চক্রবর্তী

অহনা চক্রবর্তী

এই লেখকের বই

ছোঁ

লেখক হওয়া সহজ নয়

পাছে কথা বলে ফেলি এই ভয়ে লালু আমার দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল রাখল। শিল্পীরা এমনিতেই ভীষণ খেয়ালি হয়, বিশেষ করে যারা রঙ-তুলির কারবার করে, মানে ছবি আঁকে। পান থেকে চুন খসলেই তাদের মেজাজের রঙ নাকি চটে যায়। ওর মানিকদা জাতিশিল্পী, আর্ট কলেজের সোনার মেডেল পাওয়া আর্টিস্ট, সব সময় রঙে চুর হয়ে আছেন, একটু বেগড়বাঁই হলেই কেস পস্তাবে, তখন হাতে-পায়ে ধরেও আর বাগানো যাবে না। এত সব শোনার পরে আমিও খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, কারণ ওর মানিকদাই আমার প্রথম এবং শেষ আশ্রয়। উনি বেঁকে বসলেই আমার ভরাডুবি, একেবারে কুলে এসে।

আমি কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। লালু পর্দা তুলে ভেতরে উঁকি মারল। জষ্টি মাসের ঝিমধরা দুপুর। ছুটির দিন। পুরনো আমলের বিশাল বাড়িটা গোলা পায়রার মতো নাক ডাকাচ্ছে। লালু হাতছানি দিয়ে আমাকে কাছে ডাকল, তারপর খুশিচাপা গলায় বলল, "তোর ফোরটিন পুরুষের ভাগ্যি, নন্দু। কেল্লা মেরে দিয়েছি। মানিকদা হেভি মুডে আছে—"

ভরসা পেয়ে আমি পর্দার ফাঁকে চোখ রাখলাম। চোখ জুড়িয়ে গেল। কাঁচালঙ্কা রগড়ানো, নুনের ছিটে দেওয়া ইয়া টাবলু-টাবলু কালোজাম। লালুর মানিকদা একটার পর একটা সেগুলো মুখস্থ করেছেন। বাঁ হাতে শালপাতার কুনকে ঠোঙা, সেটা নুনছাল ওঠা জামে জ্যাম হয়ে আছে। দাদার চোখজোড়া রসালো আমেজে বোজা, মুখের কামাই নেই। থেকে থেকে বেগ্‌নিরঙা জিভটা স্বাদের তারে টকাস শব্দে উঁকি দিচ্ছে, সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে আসার ভঙ্গিতে। বৈঠকখানার গড়াগড়ি খাওয়া ঢালাও ফরাসের ওপর পেট-

মোটা লাট্টুর মতো কেতরে আছেন মানিকদা আমাদের। কোমরে চেককাটা লুঙ্গির কষি আলগা, বাঁ বগলের তলায় একটা বাঁটকুল তাকিয়া, কোলের কাছে সেম সাইজের আর-একটা। ফিতে-বাঁধা ফতুয়ার ওয়াড় পরানো। সেটা নিজস্ব। অবশ্য ভুঁড়ি বলে প্রথম দর্শনে চেনা যায় না।

আমরা দুটিতে গুটি গুটি ভেতরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। পায়েব শব্দে কিছু একটা আঁচ করে মানিকদা জামরঙা চোখ মেললেন। তাঁর মৌতাত কেটে গেল, বোধহয় একটু চমকেও গেলেন। এ সময়ে দ্বিতীয় কোনো মনুষ্যমূর্তি সম্ভবত তিনি আশা করেননি। আচমকানিতে তাঁর হাতের ঠোঙা থেকে গোটা তিনেক জাম জাম্প করল, গদির ওপরে গড়িয়ে পড়ল। করুণ দৃষ্টিতে আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "আরে লালমুউনে যে।" মুহূর্ত কয়েক মুখ সামলাতে সময় নিয়ে ফের বললেন, "তাপ্পর এ সময়ে কিসের ধান্ধায়?"

"খুব বিপদ।" বলেই লালমোহন আমাকে চিমটি কাটল, "এই বল না?"

ঢোঁক গিলতে না গিলতে আমার মুখে জল এসে যাচ্ছিল, জামের কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললাম, "উঃ! মলাট।"

মলাটের সঙ্গে লালুর চিমটিঘটিত উঃ মিশে গিয়ে মানিকদার কাছে ব্যাপারটা আরও দুর্বোধ হয়ে উঠল। জামের ঠোঙা গদির ওপর নামিয়ে রেখে তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। লালুই অবশ্য শেষরক্ষা করল। বলল, "এই আমার বন্ধু নন্দর বই, ছাপা হচ্ছে, আপনাকে একখানা মলাট এঁকে দিতে হবে।"

সন্দেহ আর তারিফের চোখে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মানিকদা অট্টহাসি করে উঠলেন, "ওঃ এই ব্যাপার! আমি ভাবলাম না জানি কী হল। নে, হাত লাগা।" নিস্পৃহ ভঙ্গিতে জামের ঠোঙার দিকে হাতের ইশারা করলেন।

টকাটক কয়েকটা জাম তুলে নিয়ে লালু আমাকে ভেংচি কাটল,

"কী রে বলিনি, মলাট-ফলাট মানিকদার বাঁ হাতের কাজ!"

"থামো থামো।" মানিকদা লালুকে কথায় আর কাজে দু'তরফেই থামিয়ে দিয়ে ঠোঙাটা ছোঁ মেরে আবার তুলে নিলেন, "অত সহজ নয় যা ভাবছ। মলাট বললেই মলাট হয় না! কী মলাট, কেমন মলাট, কিসের মলাট আগে সব জানতে হবে। ক'রঙা, কী সাইজ। হাফটোন না লাইন-স্ক্রীন? গল্পের বই, তো গল্পটা শুনতে হবে আগাপাশতলা। নাও, তুমিও দুটো নাও, রাইটার বলে কতা!"

এর আগের একটা ইতিহাস আছে, খুব সুখের নয় যদিও, তবু সেটা তোমাদের জানা দরকার। সে আমার প্রথম লেখক হওয়ার কাহিনী। হায়, লেখক হওয়া যে কী ঝকমারির কাণ্ড তখন কি আর জানতাম! তখন থার্ডক্লাসে পড়ি, মানে ক্লাস এইটে। ইশকুলের লেখা-পড়া তো শিকেয় উঠেছে, অষ্টপ্রহর হাবুডুবু খাচ্ছি গল্পের বইয়ে। কষকষে রগরগে হাজার দেড়েক বই গোগ্রাসে গিলে সাবাড় করে ফেলেছি। রহস্য, রোমাঞ্চ, বিভীষিকা, অ্যাডভেঞ্চার—তার মধ্যে কী নেই! গুলি-বারুদ-খুন-জখম, ঝানু গোয়েন্দা আর ঘাগু অ্যাসিস্ট্যান্টের পিলে চমকানো, বুকে পিং-পং লাফানো লোমখাড়া করা সব বই। সেসব হজম করতে গিয়েই গণ্ডগোল, মাথা রীতিমত ছিটেল হয়ে উঠেছে। নিজে হাতে খান তিনেক বইও লিখে ফেলেছি সদ্য-সদ্য। প্রতিভা তো গোপন থাকে না, ইশকুলময় চাউর হয়ে গেছে আমার কীর্তিকলাপ। বন্ধুমহলে আমি রাতারাতি এবং রীতিমত সাহিত্যিক বনে গেছি। আমার তখন খ্যাতির ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। বই ছাপা না হলে আর ইজ্জত থাকে না! ক্লাসের বন্ধুদের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত পথে নামতে হল। কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়া অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। নতুন শিং গজানো বাছুরের মতো প্রকাশকদের দরজায় ঢুঁ মেরে চললাম।

চাঁদিফাটানো রোদ্দুরে একটা দুপুর ঘুরপাক খেয়েই সারসত্য বুঝে গেলাম, বই লেখার চেয়ে বই ছাপানো কতগুণ শক্ত। ফুটো বেলুনের মতো মুখ আমশি করে ফিরছিলাম। স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে,

গল্পটা শুনতে হবে আগাপাশতলা.

খুঁড়িয়ে হাঁটছি, জামা-কাপড় বিধ্বস্ত। ঘামে জবজবে বগলে মিয়োনো পাঁপড়ের মতো তিনখানা এক্সারসাইজ খাতা। খিদেয় তেষ্টায় ক্লান্তিতে মনে হচ্ছে রাস্তার ওপরেই শুয়ে পড়ি। বিকেল গড়িয়ে গেছে, গ্যাস-বাতিগুলোও একে একে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। আর ঠিক এমনি মুহূর্তে-দেখা হয়ে গেল 'বঙ্গশ্রী' মোহিতদার সঙ্গে। বিশাল মোটর-সাইকেলখানা ঠেলতে ঠেলতে আসছিলেন, বোধহয় তেল ফুরিয়ে গেছে। মোহিতদা ব্যায়ামবীর, আমাদের পাড়ায় থাকেন। ডাম্বেলের গোলার মতো তাঁর হাতের গুলি, পা দুখানা উল্টে রাখা পালোয়ানি মুগুর, শরীরের সমস্ত মাংসপেশী তাঁর পোষমানা। ইচ্ছে করলে কান দুটো নাচাতে পারেন, দাঁতে চেপে ইয়া মোটা মোটা লোহার পাত বাঁকিয়ে দেন।

আমার কাকতাড়ুয়া মূর্তি দেখে মোহিতদার করুণা হল। জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, কী হয়েছে? তোর এই হাল কে করল?"

আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না, চিঁ চিঁ করে বললাম, "প্রকাশক।"

"কে?" হুঙ্কার দিলেন মোহিতদা, "কোন পাড়ায় থাকে শুধু বল!" পাড়ার ছেলেদের প্রতি স্নেহে অন্ধ মোহিতদা বোধহয় ভেবে-ছিলেন বেপাড়ার কোনো ছেলে আমাকে মেরেছে। সংক্ষেপে আমার করুণ কাহিনী ওঁকে বললাম। সব শুনে মোহিতদা যাকে বলে একে-বারে মোহিত। বললেন, "তুই লিখিস জানতাম না তো! কই দেখি, দেখি?"

খাতাগুলো হাতে তুলে দিলাম। কোনো আশ্চর্য বস্তু দেখছেন এমনিভাবে পাতার পর পাতা ওলটাতে লাগলেন আর স্বগতোক্তি করে চললেন, "তুই লিখেছিস এগুলো! নিজে লিখেছিস? নিজে একা লিখেছিস, অ্যাঁ? ঠিক হ্যায়, একঠো কিতাব হাম অবশ্যই ছাপেগা—"

জীবনে অনেক মধুর হিন্দি কথা আমি শুনেছি, কিন্তু মোহিতদার মুখনিঃসৃত সেই হিন্দি বাণীর তুলনা হয় না। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।

এরপরের অংশটুকু আর কথা নয়, কাজ। পেট্রল পাম্পে তেল

নিতে যাবার কথা ভুলেই গেলেন মোহিতদা। তাঁর বিশাল ভটভটির ওপরে আমারে চাপিয়ে ঠেলতে ঠেলতেই নিয়ে গেলেন একটি প্রেসে। তারপর ধোপার বাড়িতে দেবার ময়লা জামাকাপড়ের পুঁটলির মতো আমাকে প্রেসের মালিকের হাতে উচ্ছুগ্গু করে কেবল বললেন, "এ আমার পাড়ার রাইটার! এর একখানা বই তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে বের করে দাও।"

ব্যস, কথাটি বলেই মোহিতদা দরজার দিকে পা বাড়ালেন। বিপদের পরিমাণটা আঁচ করে নিয়ে প্রেসের মালিক শ্রীযুক্ত করঞ্জাক্ষ বর্ধন কাতর গলায় ডাকলেন, "এই মোহিত, শোন, শোন, শুনে যা—"

মোহিতদা দাঁড়ালেন না, যেতে যেতে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলে গেলেন, "আমি কিছুই শুনব না, একেবারে বই দেখব। এক মাসের মধ্যে।"

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে করঞ্জাক্ষবাবু বললেন, "নাঃ, ব্যবসা-পত্তর দেখছি তুলেই দিতে হবে। এ কি ছেলেখেলা নাকি?" পাকা করমচার মতো চোখ দুটো পাকিয়ে আমার দিকে তাকালেন। কী আর জবাব দেব, চুপ করেই থাকলাম

"হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" করঞ্জাক্ষ খেঁকিয়ে উঠলেন, তারপর পাশের টুলটা দেখিয়ে বললেন, "বসো। বস্তুটি বের করো।"

দুরু দুরু বুকে আমার পছন্দসই খাতাখানা ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। খাতা খুলেই ওঁর মেজাজ আবার তিরিক্ষি, "কোত্থেকে নেকা শিখেছ? এক পৃষ্ঠায় লিখতে হয় জানো না?"

পাতার সংখ্যা দেখে বিড়-বিড় করে কীসব হিসেব করলেন, তারপর বললেন, "প্রুফ দেখতে জানো তো? অ্যাঁ, জানো না! বাঃ বাঃ, তাহলে তো হয়েই গেল। এ বই আর ইহজন্মে বেরোবে না।" আমার দিকে টেবিলের ওপরে খাতাখানা ছুঁড়ে দিয়ে উনি নিজের কাজে মন দিলেন। আমার মুখে বাক্যি নেই। সত্যি বলতে কী প্রুফ কী বস্তু তাই জানি না। বই ছাপা যে এত দুষ্কর, তাতে যে

পদে পদে এত গেরো তা জানলে কোন্ আহাম্মক আর বই লিখতে যায়!

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে থেকে খাতাটা তুলে নিয়ে উঠে আসছি। করঞ্জাক্ষ হুঙ্কার ছাড়লেন, "পালাচ্ছ কোথায়! আমার বারোটা তো বাজিয়েই দিয়েছ, এবার তোমার মুরুব্বি আমার জান কয়লা করে দিক এই তো চাও? ওটি হচ্ছে না! শোনো, আমার প্রেসের নিয়ম অথর তার বইয়ের প্রুফ নিজে দেখবে।" বলেই ড্রয়ার থেকে একটা মোটা বই বের করলেন। বইটার নাম প্রিণ্টার্স গাইড। পায়ের কাছের বেতের ঝুড়িটা থেকে এক তাড়া কাটা প্রুফ তুলে আমাকে দিলেন, "নাও হাতে কলমে শিখে নাও। দুদিন সময় দিলাম।"

এইভাবে প্রাণের দায়ে প্রুফ দেখতে শিখলাম। করঞ্জাক্ষদা মানুষটা খারাপ নন, তিনিও আমাকে সাহায্য করলেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্রুফ দেখা চলেছে, বই ছাপাও কিছু দূরে এগিয়েছে, একদিন আমাকে ডেকে বললেন, "শিল্পী-টিল্পি চেনা আছে? একখানা মলাট আঁকতে হবে, পয়সা কিন্তু দিতে পারব না বাপু।"

এই ইতিহাসের সূত্র ধরেই মানিকদার কাছে আসা। এবার আমার মুরুব্বি লালমোহন ওরফে লালু। তিন-তিনটে দুপুর মানিকদা চক্ষু বুজে গল্প শুনে গেলেন। একই গল্প বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। সেই সঙ্গে তাঁর মুখ চলল সমানে। আমারই চোখের সামনে নানা রকম ডিশ ফাঁকা হয়ে গেল। অবশেষে মানিকদা স্থির করলেন তিনি একটা মোক্ষম খুনের ছবি আঁকবেন। খুনের ছবি, তাই তাকে রিয়্যাল হতে হবে। সেই ফোর্স, সেই ফিলিং আনতে হবে। অতএব আমাকে মডেল করে তিনি ছবি আঁকবেন। আমাকে তাঁর সামনে সিটিং দিতে হবে।

সুতরাং সিটিং দিতে গেলাম। সেটাকে সিটিং না বলে হাফ হামাগুড়ি, হাফ নীলডাউন বলাই ভাল। একটা গোটা দুপুর ধরে আমাকে নিয়ে ভয়ঙ্কর কসরত চলল। বদরাগী নাপিত, খিটখিটে

ফোটোগ্রাফার আর অতি খুঁতখুঁতে সিনেমা-পরিচালক—এই তিন ব্যক্তি একসঙ্গে হয়েও হয়তো একটা মানুষকে অতখানি টর্চার করতে পারত না। মানিকদা একাই আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশিই ঘায়েল করলেন। সেদিন আমার দুটো ভূমিকা ছিল। আমিই নিহত লোক, আবার আমিই তার হত্যাকারী। ফ্লেকসিবল টেবল ল্যাম্পের নলের মতো আমার ঘাড় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে ঘণ্টা-ঘণ্টা ভর রেখে আমাকে অ্যায়সা মডেল বানালেন যে, বাড়ি ফিরে দিন তিনেক ফিকব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম।

কদিন পরে মানিকদার বাড়ি যেতেই তিনি পাতলা কাগজে প্যাক করা ছবির মোড়কটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললেন, "নাও তোমার ছবি রেডি। ওয়াণ্ডারফুল হয়েছে। আমার নামটা ছাপতে যেন ভুলো না। মানিকচন্দ্র হুই।"

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে করঞ্জাক্ষদার কাছে চলে গেলাম। প্যাকেট খোলা হলে ছবি দেখে আমি থ হয়ে গেলাম। দুটি বিশালাকায় মানুষ একটা প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর মরণ-আলিঙ্গনে জাপটাজাপটি করছে। একজনের হাতে একটা রক্তমাখা ছোরা। যে টেবিলটার ওপর মডেল হয়ে আমি কসরত করেছিলাম সেটা চিনতে পারলাম। আর একটা ব্যাপার খুব চেনা লাগল। ওই প্রমাণ সাইজের লোক দুটোর পরনে দুটো খাটো হাফপ্যাণ্ট, সেদিন আমি যা পরেছিলাম। এছাড়া আর কোনো মিল নেই।

"ছি ছি, এ কী হল করঞ্জাক্ষদা!" মাথায় হাত দিয়ে আমার তখন বসে পড়ার অবস্থা, "কী হবে এখন?"

"মারো গুলি!" খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন করঞ্জাক্ষদা, "ফাস্ কেলাস জমবে, একেবারে জ্যায়সা কা ত্যায়সা! অথরের বয়সটা অন্তত আন্দাজ করা যাবে।"

টোটকা

নতুন কাকী আসার পর কানুরা ভেবেছিল ওদের ফাঁড়া কেটে গেল, বড়কাকা আর ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। দিন পনেরো-কুড়ি বড়কাকা একটু অন্যমনস্ক থাকল, অঙ্ক কষাতে বসল না, ট্রানশ্লেশনের টাস্ক দিল না। ওদের খেলনাপাতির দিকেও বাঁকা চোখে তাকাল না। তারপর যে কে-সেই। ঠাকমা ঠিকই বলে, মানুষের স্বভাব যায় না মলে! বড়কাকার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কাকী যোগ দিল তার সঙ্গে। একা কাকায় রক্ষে নেই, কাকীমা দোসর। বড়কাকা যদি বা একটু ঝিমিয়ে পড়ে বড়কাকী তাকে উসকে দেয়। ফলে কানুদের লাইফ হেল্ হয়ে উঠল। আজকের ঘটনাটাই ধরা যাক, কাকা না সন্ধান দিলে কানু আর চুপ্লিকে সিঁড়িঘরে এসে বামাল ধরে ফেলা সম্ভব হত না বড়কাকার পক্ষে। কাপড় শুকোতে দিতে এসে কাকীই তো দেখে গিয়েছিল ওদের। তারপরই যমদূতের মতো বড়কাকার অনুপ্রবেশ। সঙ্গে গাইডরূপী কাকী। দুজনেই শিকারী বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে এসেছে। ওহ্, একটু পায়ের শব্দও যদি পেত, শখের জিনিসটাকে তাহলে লুকিয়ে ফেলতে পারত ওরা, জিনিসটা হাতছাড়া হয়ে যেত না।

টাইমপীসে দম দেওয়ার কায়দায় কানুর ডান কানে গোটাদুই মোচড় দিয়ে বড়কাকু বলল, "বুঝলি রে লম্বকর্ণ, অলস মস্তিষ্ক হচ্ছে শয়তানের কারখানা।" তারপর কানুর হাতের এয়ারগানটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল যেন। চোখ দুটো আগ্রহে উল্লাসে চক চক করে উঠল, "দেখি, দেখি, এটা আবার কবে এল?"

কানে চাবি দেওয়ার দৃশ্যে কাকী মুখে আঁচল দিয়ে হাসছিল।

এবার মুখ খুলল, "ছোট্‌ঠাকুরপো কিনে দিয়েছে, তোমাকে বলিনি বুঝি? দারুণ জিনিসটা কিন্তু!"

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া একেই বলে। কানু ভাল করেই জানে, কাকী হচ্ছে বড়কাকার নিজস্ব সংবাদদাতা। আগেভাগেই ঠিক লাগিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কিছু করার নেই, বড়কাকার কথা মানেই হুকুম, অক্ষরে অক্ষরে বিনা আর্জিতে পালন করতেই হবে। দুরুদুরু বুকে সদ্য পাওয়া হাওয়াই বন্দুকটাকে সাক্ষাৎ জল্লাদের হাতে তুলে দিল কানু। ব্যথায় আর অভিমানে চোখে জল এসে গিয়েছিল ওর। অপমানে লজ্জায় কানটা লাল আর গরম হয়ে উঠল।

অভিধানে দেখেছে লম্বকর্ণ মানে গাধা। নতুন কাকীর সামনে এই প্রথম বড়কাকা তাকে গাধা বলে সম্বোধন করল। গাধাদের কান খুব লম্বা হয়। কানুরও কান দুটো বড় বড়। ঠাকুমা বলে কান বড় হওয়া সুলক্ষণ। বড়কাকা অবিশ্যি তা মনে করে না। না করুক, কিন্তু তার কান বড় হওয়ার পেছনে কার হাত আছে সে জানে। অঙ্ক কষাতে বসিয়ে টেনে টেনে লম্বা করে দিয়েছে কোন বীরপুরুষ? রিয়্যাল গাধাদের নিশ্চয় বড়কাকা নেই, ভাগ্যিস নেই, তাহলে বেচারিদের কান অ্যাদ্দিনে মাটি ছুঁয়ে ফেলত!

কিন্তু কানুর বড়কাকা এই কানের ব্যাপারে একদম নিরপেক্ষ নয়। একটা কানের ওপরেই তার ঝোঁক বেশি। ওর ডানকানটা তাই বাঁ কানের থেকে একটু বেড়ে গিয়েছে যেন। কাল হঠাৎ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে কেমন খটকা লাগল। ছোটবোন চুল্লিকে দেখাতে সেও ভারিক্কি চালে ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁরে দাদা, ঠিক বলেছিস একচুল বড় বলেই তো মনে হচ্ছে।" শুনে ইস্তক শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে, মনের মধ্যে রীতিমত অস্বস্তি খচখচ করছে। তার ওপর কাল রাতে আর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। তার কানটা যে গরুর ল্যাজের মতো লম্বা হয়ে হাঁটু ছাড়িয়ে ঝুলছে। সত্যি সত্যিই যদি সেরকম কাণ্ড হয়ে যায়। তাহলে আর ইস্কুলে মুখ দেখাতে পারবে না। হয়তো কাটিয়ে ফেলা ছাড়া উপায় থাকবে না। অপারেশন করে

ডাক্তাররা তো আজকাল হাত-পা কত কি কাটছেন। না-হয় কানও কাটানো গেল। কিন্তু তাতেই কি শেষ রক্ষে হবে। লোকে দু-কান-কাটা বলবে, হাসাহাসি করবে। শার্টের তলাটা দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলল কানু।

বড়কাকা ততক্ষণে বন্দুকটার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। কাকী ঝুঁকে পড়ে বন্দুকের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "কী অদ্ভুত জিনিসটা। সত্যি সাহেবদের মাথা আছে। বারুদ-ফারুদ লাগে না। শুধু হাওয়ার ধাক্কায় নাকি গুলি বেরোয়। হ্যাঁ গো, সত্যি?"

ব্যস, সর্বনাশের যেটুকু বাকি ছিল হয়ে গেল। কাকীর ওই একটা কথাই বড়কাকাকে উসকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট বড়কাকার বিঘতখানেক লম্বা নাকের দু'পাশে ভাঁজ পড়ল, ভুরু দুটো মাছ গেঁথে ফেলা ছিপের মতো বেঁকে গিয়ে কপালে উঠল। নাসারন্ধ্র দিয়ে একটা অবজ্ঞার শব্দ বেরল, বলল, "বোগাস, এর মধ্যে কলাকৌশল কিস্যু নেই। বিশ্বাস না হয় আমি তোমাকে দেখাব।" হঠাৎ চোখ তুলেই কানুর ফ্যাকাশে মুখখানা দেখতে পেয়ে বড়কাকা চোখ পাকাল, "এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছিস! যা যা, পড়তে বসগে যা। এটা বিকেলে ফেরত পাবি।"

কোনো রকমে চোখের জল সামলে কানু চিলেকোঠা থেকে নীচে নেমে এল। চুল্লিও ওর পেছন-পেছন। কথা যখন দিয়েছে তখন কথা ঠিকই রাখবে বড়কাকা। এর আগেও রেখেছে, নড়চড় হয়নি। বিকেলে বন্দুক ফেরত পেয়ে যাবে। যেমন পেয়েছিল সেই দম দেওয়া ডবল ইঞ্জিনের রেলগাড়িটা, মিনি টর্চ লাইট আর জগঝম্প বাজানো চাবি বসানো শিম্পাঞ্জিটাকে। চুল্লির বড় আলুর পুতুল আর অর্গানটাও ফিরে এসেছিল, তবে কোনোটাই আস্ত অক্ষত অবস্থায় ফেরেনি। গত জন্মদিনে পাওয়া দূরবিনটার কথা মনে পড়তে বুকের ভেতরটা আবার হু-হু করে উঠল।

বড়কাকার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তা কানুর চেয়ে আর কে হাড়ে হাড়ে জানে। যন্ত্রপাতি দেখলেই বড় কাকার

হাত নিসপিস করে, মগজের মধ্যে চুলকোনি শুরু হয়ে যায়। তিন মিনিটে সব নাটবল্টু ইসকুরুপ খুলে, জোড়-ঝালাই তার-ফার হাঁটকে, স্প্রিং-প্যাঁচ কেটে চিচিং ফাঁক করে দেবে। লাস্ট পয়েন্টে পৌঁছে যাবে। কিন্তু তারপর রিটার্ন জার্নিতেই কেলেঙ্কারি। মহাভারতের অভিমন্যুর মতো, যে-কোনো জটিল ব্যূহ ভেদ করতে বড়কাকা ওস্তাদ, সেঁধুতে পারে কিন্তু বেরোতে পারে না।

যন্ত্রপাতির ব্যাপারে বড়কাকার এই নাক-গলানো স্বভাবটার পেছনে একটা কারণ আছে। আই এস-সি পাশ করার পর বড়কাকা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্যে ঘোরাঘুরি করেছিল কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত ও লাইনে হয়নি। সেই জন্যে মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ রয়ে গেছে। ওর ধারণা ভুল পথে পড়াশোনা না করলে ওর প্রতিভা গোপন থাকত না। অনেক পাশ-করা লোকের চেয়ে ও পাশ না করেই অনেক বেশি জানে। সুযোগ পেলেই হাতে-কলমে একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেয়। বাবা আড়ালে হাসেন আর বলেন, "আহা, নতুন দাঁত উঠেছে বোধহয়।"

চুল্লি বলল, "দাদা রে, তোর অমন সুন্দর বন্দুকটাও এবার গেল।"

কানু রাগী গলায় বলল, "নতুন কাকীই এর জন্যে দায়ী। এসে ইস্তক কিভাবে আমাদের পেছনে লেগেছে দেখেছিস তো!"

চুল্লি তার ছোট বেণীটা দুলিয়ে কাকীর উদ্দেশে দুবার আচ্ছাসে জিভ ভেঙিয়ে নিয়ে হিংসুটে গলায় বলল, "দাঁড়া না মজা দেখাচ্ছি।"

কানু অবাক চোখে বোনকে দেখছিল, বলল, "কী মজা দেখাবি?"

"বাবাকে বলে দিচ্ছি দেখ না।"

কানুরও রাগটা এখন আর বড়কাকার ওপরে নেই, সব গিয়ে কাকীর ওপরে জড়ো হয়েছে। আসলে বড়কাকাকে যমের থেকেও বেশি ডরায়। তার ওপরে রাগ-টাগ দেখাবার কথা কল্পনাও করা যায় না। দুঃখের হাসি হেসে কানু বলল, "ধ্যুস, বললে এইটা হবে।" বলে বুড়ো আঙুলের কাঁচকলা দেখাল। বড়কাকা বাবার খুবই আদরের ভাই, বাবার কেমন একটা একচোখোমি আছে। তাছাড়া

বাবা মানুষটাই মজার, সব ব্যাপারেই মজা ভালবাসেন। বড়কাকার ডাক নাম নাকু, বাবার রাখা। কানুর এই মুহূর্তে মনে হল, জন্মাবার পর বড়কাকার নাকটা খুব লম্বা ছিল বলেই হয়তো বাবা ওই নাম রাখেননি। বড়কাকা যে বড় হয়ে খুব নাকউঁচু হবে আর সব ব্যাপারে নাক গলাবে এ কথা বোধহয় বাবা টের পেয়েছিলেন। বাবার এই রকমই স্বভাব। তার নামটাও লম্বা কানের দরুন কানু হয়েছে। বোনটির মাথায় খুব চুল, তাই চুল্লি।

চুল্লি বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে বলল, "এর প্রতিশোধ নিতেই হবে।" ওর মুখে কিছুতেই র-ফলা আসতে চায় না। না আসুক, কানুও সেই মুহূর্তে প্রতিশোধ কথাটাই মনে মনে উচ্চারণ করছিল, তবে র-ফলা সহযোগে।

বাগানের দিকে টানা বারান্দাটা রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে। কাপড় মেলার তারের এক কোণে একটা ঝাঁকড়া ডাল ঝোলানো রয়েছে। কালো কালো পাতাগুলো শুকিয়ে খরখরে হয়ে আছে। কানু সেই দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ছোটকা বটানি পড়ে, লতা-পাতার দিকে খুব ঝোঁক। এটা ছোটকার আমদানী।

চুল্লি দাদার চোখের নজর অনুসরণ করে বলল, "খুব তেতো।"

চমকে উঠে কানু বলল, "কালমেঘের পাতা তো তেতোই হবে। কিন্তু খুব উপকারী।" বলে হাসল দাঁত বের করে।

চুল্লি দাদার হাসির কারণটা বুঝতে না পেরে হাঁ করে রইল।

কানু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "কাকী রোজ দুপুরে ঘুমোয়, না রে?"

"রোজ।"

"হাঁ করে ঘুমোয় তোর মতো?"

তুলনা দেওয়ায় চুল্লি খুব রেগে গেল দাদার ওপর। বলল, "ভাল হবে না কিন্তু, দাদা! আমি বুঝি অমনি বিচ্ছিরি হাঁ করে ঘুমোই?"

বোনকে চটালো না কানু। বলল, "না না, তোকে ফাস্টকেলাস দেখায়। শুধু নাল গড়িয়ে একটু বালিশ ভিজে যায় এই যা।"

"এখন কি আজেবাজে কথার সময়!" চুল্লি চটেমটে বলল।

কানু বলল, "ভুলে যা। আমি এখন পতিশোধের কথা ভাবছি।"

জবাবে দাদার হাতে একটা চিমটি কেটে চুল্লি বলল, "আহা আমি যেন পতিশোধ বলি!"

কানু বলল, "যা, এখন নষ্ট করার মতো সময় নেই আমাদের হাতে। রান্নাঘর থেকে নোড়াটা নিয়ে আয়। না না থাক।" কানু কান পেতে রান্নাঘরে বাটনা বাটার শব্দ শুনল একটুক্ষণ, তারপর বলল, "বাবার গোল পেপার-ওয়েটটা হলেই চলবে। নিয়ে আয়।"

"কী করবি?" যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল চুল্লি।

"কালমেঘ খুব উপকারী", কানু মিটির-মিটির হাসে, "যা একখানা কবরেজি দাওয়াই বানাবো দেখবি।"

তারপর সারা সকাল রোয়াকের ওপর কালমেঘের পাতার মিহি পাউডার বানানো হল। যত্ন করে একটা খালি শিশিতে ভরাও হল। তারপর চুল্লি আর কিছু জানে না। ঘটনাটা ঘটল প্রায় বিকেলের দিকে। আঁ-আঁ করে একটা বিকট চিৎকার দিয়ে নতুন কাকী দমকলের মতো বাথরুমের দিকে ছুটে গেল। তারপর মুখ ধোয়ার শব্দ, বমির শব্দ। তারও কিছু পরে বাড়িময় খোঁজ-খোঁজ রব উঠল। কানুকে কোথাও পাওয়া গেল না।

সন্ধে বেলায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরে স্নান সেরে বাবা প্রতিদিনকার অভ্যেস মতো দরজার পাশ থেকে গুটোনো মাদুরটা টানতে গিয়েই চমকে উঠলেন। পাটিসাপটার পুরের মতো গায়ে মাদুর জড়িয়ে শ্রীমান কানু দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

চুল্লির সন্দেহ, দাদা বাবার হাতে ধরা দেওয়ার জন্যেই ইচ্ছে করে ওখানে গা-ঢাকা দিয়েছিল।

মানুষের কাঠামো

কাঠি আইসক্রীমের দলটা চৌমাথার চৌধুরীকাকার গ্রীল ঘেরা রোয়াকে বসে সেরেফ যেন বুড়ো আঙুল চুষছিল। একেবারে ফুল টিম, একেবারে ফুল বেকার। কবি-লেখকদের এক একটা সময়, বোধহয় ঠিক এই সময়টাই, একেরে ডাল যায়, গোয়েন্দাদেরও তেমনি। কোনো বায়নাপত্তর থাকে না। কলম বন্ধ হয়ে যায়।

কদিন আগে পুজো শেষ হয়েছে। নতুন জামা জুতো আর পুজো-সংখ্যাগুলো একটানা এবেলা-ওবেলা ডবলমার্চ করে তার জেল্লা হারিয়েছে। শরৎকালের আকাশটা অলিগলি রাস্তার ওপরে আধ-পুরনো শালুর মত ঝুলছে। মাদারেরা সব এসে বারোয়ারি পুজোর প্যাণ্ডেলে বসে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে ভ্যানিশ হয়ে গেছেন। মাদার দুগ্‌গা টু মাদার কালী, টাইম-টেবল দেখে কলকাতা থেকে যদি পঞ্জিকামতো সদলবলে কেটে পড়লেন, তাহলে আর রইল কি! না উৎসব, না হুজুগ হল্লা। ছিটে-ফোঁটা বলতে ওই ভাই-ফোঁটা, এক বেলার আসনপিঁড়ি দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সেটাও শেষ। এখন খোলো ইস্কুল, মাখো তেল, বইখাতা বগলে ভেতো মুখে ইস্কুল যাও। লাগাতার ছুটির পর রেগুলার ইস্কুল যেতে কোন্ ছেলেটার ভাল লাগে কে জানে, ওদের লাগে না।

কুট্টু বুবুনের হাতের দশাসই আইসক্রীমটার দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োর মত অবাক চোখে দেখতে দেখতে ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার নিজের হাতেরটার অবস্থা ভাল না, রং-মাটি গলে গিয়ে কাঠামো বেরিয়ে পড়া প্রতিমার মত এখন বলতে গেলে কাঠিসার দশা। ওই হ্যাংলা ছেলেটা কি রহস্যময় উপায়ে জিইয়ে জিইয়ে রেখে এখনো আইসক্রীমটাকে ফিকসড্ ডিপোজিট করে রেখেছে কে জানে।

বোধহয় এই দুঃখেই আর একটা পড়তি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপা দিয়ে সে বলল, 'নাঃ সীজন্‌টা খুব ডাল যাচ্ছে!'

বুবুন ওর গোপন দুঃখ আঁচ করেই সম্ভবত মুচকি হাসল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ ডাকাতি-ফাকাতির কথা ছেড়েই দে, নিদেনপক্ষে একটু ছিনতাই ফিনতাই যে হবে, তাও হচ্ছে না!' বলেই আইসক্রীমে এমন শব্দ করে একটু চুমু খেল যে দলের সবাই চমকে ওর দিকে মুখ ফেরালো। কুট্টুর মুখ চোখ লাল, তার সন্দেহ বুবুন ওকেই ইনসাল্ট করল।

বাবুয়া বলল, 'হ্যাঁ খুন রাহাজানি শেষ মানেই, আমাদের এই গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানেরও শেষ। কিছুদিন যাওয়া বা খবরের কাগজের কেসগুলো নিয়ে হোম-টাস্কের জাবরকাটা যাচ্ছিল এখন সে পুঁজিও শেষ। সুকুমার রায়ের মত আমাদেরও এখন বলতে ইচ্ছে করছে—হাতে রইল পেন্সিল!'

'কিংবা শুধু আইসক্রীমের কাঠি!' বুবুন আরও একবার সশব্দে রসগ্রহণ করতে করতে বলল।

সুনন্দ তেতো গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'বেরসিকের মত কথা বলিস না, কিছুই শেষ না, দেখতে জানলে আছে। আসলে তুমি জিনিসটা কি ভাবে দেখছো সেইটেই কথা! কি, ব্যাপারটা তোমার মোটা মাথায় ঢুকল?'

বলাবাহুল্য সুনন্দর হাতে তখন পর্যন্ত শুধু কাঠিটাই ধরা ছিল, সে আলগোছে সেটাকে রাস্তায় ফেলে দিল।

সুড়ুৎ করে আর একটা মৌজের টান দিয়ে বুবুন বলে, 'কঠিন কথা কিছু নয়, বুঝেচি।'

'ছাই বুঝেছ।' সুনন্দ তার পিসতুতো ভাইকে ডেঁটে দেয়।

কেন এই ধরো গিয়ে তোমার, বীজ আগে না ফল আগে থিওরী। বাবার কাছেই শুনেছি, পৃথিবীতে ফলই শেষ, না ফলেই শুরু এই নিয়ে তর্কের কোন মীমাংসা হয়নি। তাই বাবাইদাদা (সুনন্দর ডাক নাম) যে কাঠিটা তুমি এইমাত্র সকলের নজর আড়াল করে মানে মানে

ফেলে দিলে সেটা শেষ নাও হতে পারে। কে জানে কাঠি থেকেই শুরু, যেমন প্রতিমার, কাঠামোই তো আসল আর সব প্রথমের জিনিস।'

বাবাইকে দাদা বলায় ওর মনটা নরম হয়েছিল, তাছাড়া এই ভাইটির জন্যে ওর ভেতরে ভেতরে একটা গর্বও আছে। এই বয়সেই ও দিব্যি পদ্য বানাতে শিখেছে। এট্টু লোভী তা হোক, এট্টু বোকা-সোকা দেখতে তাও মাপ, কারণ সময়ে স্‌ময়ে ওর মাথা খুলে যায়, তখন সকলের ওপর টেক্কা দেয়। তাই ওর মুখে এমন সুন্দর একখানা তত্ত্বকথা শুনে ও যখন হাসিমুখে মাথা দোলাচ্ছিল তখন কালী চক্কোত্তি মানে অহনা মেনি বেড়ালের মত দাঁত খিঁচিয়ে ফ্যাঁচ করে উঠল, 'অ্যান্টিসোসালের মত কথা বলিস না, কিপ্টের যাশু!'

বাবাই ধমকে দিল, 'থাম থাম, মেলা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিস না। না হয় এবার কেলাসে ফাস্টু হয়েচিস, অত পাকা-পাক কথা কেন রে! মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাকবি।'

চুলে রিবন দিয়ে একটা ফুল বানাচ্ছিল কালী, চটে গিয়ে জিভ ভেংচে রইল কয়েক সেকেণ্ড। বাবুয়া বয়সে ওদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়, সে বলল, 'এই জন্যে বাঙালীর কিস্যু হল না, কেবল নিজেদের মধ্যে হুলোহুলি চুলোচুলি। তার চেয়ে আয়, মানুষধরা খেলা খেলি।'

খেলাটা পুরনো। এ খেলা বলতে গেলে বিলিতি গোয়েন্দা শার্লক হোমসই প্রথম খেলেছেন। তিনি যে কোনো মানুষের চাল-চলন পোশাক-আশাক কিংবা তার চুলের রং, জুতোর ভাঁজ, হাতের পায়ের কড়া দেখে তার জীবিকা তার চারিত্র বলে দিতে পারতেন। সুনন্দরাও প্রথম দিকে খুব খেলতো এই খেলাটা। তাদের অনুমান সব সময় যে মিলতো বা সব সময় যে মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়া যেত তা নয়, তবে মানুষের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে শার্লকী কায়দায় বেশ বিজ্ঞের মত কোনো মন্তব্য করতে বেশ আনন্দ আর উত্তেজনা পাওয়া যেত।

সুনন্দ নেচে উঠে বলল, দি আইডিয়া—তাই হোক। আচ্ছা ওই যে লোকটা মাথায় টাক, কাঠ বেড়ালীর ল্যাজের মত ঝোলা গোঁফ, হাতে একটা ভারী ফোলিও ব্যাগ, ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হন-হনিয়ে এদিকেই আসছেন, আচ্ছা ছাখ ছাখ, সূর্যটা কোন্‌দিকে খেয়াল নেই, উলটো দিকে দিব্যি ব্যাগটাকে ছাতার মত ধরে আছেন, ওঁকেই আমরা আয় ওয়াচ করি—'

অহনা মুখ বাঁকিয়ে মন্তব্য করল, 'নেই কাজ তো খই ভাজ!'

সবাই চটে গেল কথাটা শোনা মাত্তর। বাবাই বলল, 'খই ভাজা কখনো নিজের চোখে দেখেছ বৎসে? নেই-কাজ নয়, ওটাও রীতিমত কাজ, এবং কঠিন, যত সোজা ভাবছো তা নয়!'

অহনা পাল্টা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে সুযোগ আর হল না। বাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ খুব উত্তেজিত শোরগোল শোনা গেল। খানিকটা ভয় খানিকটা বিস্ময় মেশানো মেয়েলি গলার চিৎকারও যেন কানে এল। রবিবারের সকাল, বেলা প্রায় সাড়ে দশটা হবে। চৌধুরীকাকাদের বাড়ির ভেতর রাজমিস্ত্রী লেগেছে আজ কদিন থেকে। ভেতরের দিকের শেষের ঘরখানাকে ভেঙে ফেলে বড় হল ঘর বানানো হচ্ছে। সুনন্দর দলবল ছুটল কি হয়েছে দেখতে।

গিয়ে যা দেখল তাতে চক্ষু স্থির। কুলি কামিন আর রাজ মিস্তিরি কাজ বন্ধ করে একপাশে দাঁড়িয়ে ব্যাজর ব্যাজর করছে তাদের দেহাতি ভাষায়। ওদের চিৎকার শুনে চৌধুরীকাকা ওপর তলা থেকে তাড়াহুড়ো করে নেমে আসতে গিয়ে লুঙ্গির গেরো খুলে একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন, সেইসব এই মাত্তর সামলে নিতে নিতে ভাঙ্গা দেওয়ালের গহ্বরে ঝুঁকে তাকিয়ে কি যেন দেখছেন।

কুট্টু ছিল সকলের আগে। দৃশ্যটা দেখে সে আপনা থেকেই দু'পা পিছিয়ে এল, 'আরিব্বাবা এ যে ভূত।'

'কী ভূত! কোথায় ভূত?' বাবুয়া উঠে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে গেল, সেই সঙ্গে সুনন্দও।

পশ্চিমের দেওয়ালটা তখনো পুরো ভাঙা হয়নি। আধখানা

দেওয়ালের এক পরত ইট আর পলেস্তারা খসাতেই প্রায় দরজার একটা চতুষ্কোণ গহ্বর বেরিয়ে পড়েছে। সেকেলে বাড়ি, প্রায় তিরিশ পঁয়তিরিশ-ইঞ্চি পুরু দেওয়াল, আজকের দিনে যা ভাবাই যায় না। এখন পাঁচ দশ কি খুব বেশী হলে পনের ইঞ্চির দেওয়াল হয়। তা এবাড়ির ঐ মোটা দেওয়ালে এক জায়গায় বুঝি ওয়ার্ডরোবের মত কিছু একটা ছিল। পরে সেই ফাঁপা জায়গাটা তিন ইঞ্চির গাঁথনি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। নিখুঁত পলেস্তারা থাকায় বাইরে থেকে বোঝা যায়নি। এখন সামনের আড়াল ভেঙে ফেলতেই একটা প্রমাণ সাইজের হাঁ মুখ গহ্বর বেরিয়ে পড়েছে। এবং সেই গহ্বরের মধ্যে আর একটি হাঁ মুখ দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার মতন দেওয়ালের ভেতরে প্রথম ঝলকে ভাল করে দেখা যায় না। দ্বিতীয় বার তাকাতেই চোখে অন্ধকার সয়ে যাওয়ায় একটি নরমুণ্ড স্পষ্ট হয়। নরমুণ্ড বললে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে না, সেটা মড়ার মাথার খুলি, আসলে আস্ত একটা কঙ্কাল, মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছে। চোখ নাকের গর্ত বীভৎস, মুণ্ডটা বিকট দু'পাটি দাঁত বের করে হাঁ করে আছে। যেন কাছে গেলেই কামড়ে দেবে।

চৌধুরীকাকা এপাড়ায় খুব বেশীদিন আসেন নি। বছর তিনেক আগে ওঁর বাবা এই বাড়িটি কিনেছিলেন এক লোহার ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের কাছ থেকে। লোকটি ছিলেন রাম কঞ্জুস, এখনো নাকি তাঁর নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। লোহা এবং সুদের কারবারে লোকটা ফুলে ফেঁপে বিশাল বড়লোক হয়ে যায়। নিউ আলিপুরে নতুন বাড়ি করে তিনি উঠে গেছেন ক'বছর আগে। তারপর চৌধুরীকাকারা এপাড়ায় এলে পাড়ার লোক যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। পাড়ার দুর্গাপুজোয় যে লোক তিনদিন ঘুরিয়ে, আজ বারবেলা, কাল লক্ষ্মীবার, পরশু মাস পয়লা কি অমাবস্যা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত নগদ এক টাকার উর্ধ্বে ওঠেন না, সে মানুষের সঙ্গে কারো ভালমন্দ কোন সম্পর্কই গড়ে উঠতে পারে না।

দেওয়ালের ভেতর থেকে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ায় চৌধুরীকাকা

প্রথমে যতটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, পরে ততটাই উদীপ্ত হয়ে উঠলেন একটা সম্ভাবনার কথা চকিতে মাথায় খেলে যেতেই। তাঁর কেমন মনে হল, এ নিশ্চয় সখের কঙ্কাল। দেওয়ালটা ভাল করে খুঁজলে হয়তো গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে। বেশী নয় এক ঘড়া মোহর পেলেই তিনি সন্তুষ্ট, কষ্ট করে আর অফিসে খেটে খেতে হবে না। যে হাড় কেপ্পন মানুষের বাড়ি তাতে তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের কেউ যে ধনরত্ন কিছু দেওয়াল গেঁথে লুকিয়ে রাখবে না এরকম ভাবাটাই বরং আশ্চর্যের ব্যাপার। হঠাৎ বড়লোক হওয়ার উন্মাদনায় চৌধুরী-কাকার মাথার ঠিক ছিল না, আর একটা বিপজ্জনক আশঙ্কার কথা তখনো তাঁর মনে আসেনি। মনে হয়নি পুলিস নামক একটি জাগ্রত দেবতা এ শহরে আছেন যাঁরা একবার নরকঙ্কালের গন্ধ পেলে এখানে এসে ঝামেলা পাকাবেন। কঙ্কালটা ইতিহাসের সামগ্রী হলেও চৌধুরীকাকাকে নিয়ে যে থানা এবং লালবাজার অবধি টানা-টানি পড়ে যেতে পারে এই বাস্তব ব্যাপারটা তখনো তাঁর সরল মগজে ঢোকেনি।

দু'পক্ষকেই তাড়া লাগালেন চৌধুরীকাকা, 'এই তোমরা সব হাত লাগাও, হাত লাগাও। শাবল, ছেনি একটু সাবধানে চালাবে। আর তোমরা, অ্যাই তোমাদের বলছি, ক্ষুদে ভাইপো ভাইঝির দল, বাড়ি যাও বাড়ি যাও। ভুতে ঘাড় মটকে দিলে বুঝবে—'

শুধু মুখেই নয়, বাবুয়া আর সুনন্দকে হাতে ধরে সরিয়ে দিলেন সামনে থেকে। চৌধুরীকাকার এই দূর-দূর ব্যবহারে সব্বাই খুব দমে গেল। এই 'ডাল' সীজিনে যদিবা একটা চমকপ্রদ ব্যাপার প্রায় পড়ে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে গুড়ে বালি।

এমন মজাদার ঘটনা থেকে চাক্ষুষ বঞ্চিত হয়ে শুকনো মুখে ফিরে যাবে একি হয় নাকি! সুনন্দ ভেতরে ভেতরে চটে গিয়ে বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি চৌধুরীকাকা, তবে পুলিস এল বলে। আর তারা এলে কিন্তু সহজে যাবে না, আর যখন যাবে আপনাকেও ফ্যাসাদে জড়িয়ে রেখে যাবে।'

চৌধুরীকাকা কঙ্কাল দেখার পর এই দ্বিতীয়বার চমকে উঠলেন, 'কে? কে বললে কথাটা। অ তুমি, কি করে বললে কথাটা? পুলিস আসবে? তা পুলিস কেন আসবে শুনি? তাদের কী এত মাথা ব্যথা! জ্যান্ত মানুষ মরে গেলেই কেয়ার করে না আজকাল, তা এ তো ভূত, আই মীন কঙ্কাল!'

'এও একদিন জ্যান্ত মানুষই ছিল!' সুনন্দ বলে, 'আপনার দেওয়ালের ভেতর থেকে এক জ্বলজ্যান্ত মানুষের কঙ্কাল বেরোবে আর ওরা চোখ বন্ধ করে থাকবে ভেবেছেন? এই লোকটিকে যে খুন করা হয়নি সে কথা কি কেউ হলফ করে বলতে পারে?'

বাবুয়া বলল, 'হ্যাঁ এরকম একটা কেস আমি কাগজেও পড়েছিলাম যেন। এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ, অনেক জল ঘোলা হবে দেখে নেবেন। এক বাড়ির কুয়ো থেকে এরকম কঙ্কাল বেরিয়েছিল বলে পুলিশ বাড়িশুদ্ধ সবাইকে খুব টানাহ্যাঁচড়া করেছিল, মামলাটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল, এখন যেন মনে পড়ছে।'

অহনা বলল, 'ও সেই পাতিপুকুরের কেসটা তো? আমিও পড়েছি বাবুয়াদাদা!'

'অ্যাঁ, কী সর্বনাশ!' চৌধুরীকাকা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর মুখ দেখে সুনন্দর মনে হল তিনি রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। হয়তো কল্পনায় নিজেকে কোর্টের কাঠগড়ায় দেখছেন তিনি এই মুহূর্তে।

'আমরা চললাম চৌধুরীকাকা,' সুনন্দ তারিয়ে তারিয়ে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, এসব উটকো ঝামেলার মধ্যে আমাদের না থাকাই ভাল। পুলিসে ছুঁলে আঠারো ঘা, একথা কে না জানে।'

'চল পালাই।' বাবুয়া মিছিমিছি একবার কুট্টুর হাত ধরে টানল।

চৌধুরীকাকার চোখ খুলে যেতে বিলম্ব হল না। তাড়াতাড়ি সুনন্দর দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, 'আহা তোমাদের আমি সরে যেতে বলেছিলাম, একেবারে চলে যেতে তো বলিনি। তা ইচ্ছে হলে

থাক না তোমরা, থাক। ইয়ে, তোমার সঙ্গে তো শুনেছি ডি. সি.. ডি. ডি. কে. রায়ের খুব জানাশোনা আছে। ভাল কথা তোমার বাবা আছেন এখন বাড়িতে? আইন-ফাইনের ব্যাপারটা উনি ভাল বুঝবেন আমাদের থেকে।'

সুনন্দর বাবা উকিল, মোটামুটি পশার এবং নামডাক আছে। কিন্তু বাবা এখানে এলে কেসটা অন্যরকম হয়ে যাবে। পত্রপাঠ বিদায়ও নিতে হবে ওদের সবাইকে। সেটা ওর ইচ্ছে নয়। ও তাড়াতাড়ি বলল, 'বাবা কেন, যদি বলেন আসল লোকের সঙ্গেই আপনার যোগা-যোগ করিয়ে দিতে পারি। শুধু অ্যাডভাইস নয়, প্রয়োজন হলে তিনি আপনাকে সাহায্যও করতে পারবেন।'

অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পেয়ে চৌধুরীকাকা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই কিন্তু আসল লোকটি কে?'

গলায় যথেষ্ট পরিমাণে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে সুনন্দ বলল, 'কে. রায়.. ডি.সি.ডি.ডি.।'

সুনন্দর কপাল আজ খুব ভাল ছিল বলতে হবে।

এক চান্সেই কমলেশকাকাকে পাওয়া গেল। তিনি বাড়িতেই ছিলেন এবং ফ্রি ছিলেন। শুধু তাই নয়, কঙ্কালের ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন। তিনি না পৌঁছানো পর্যন্ত কেউ যেন ওখানে আর হাত না দেয়, টেলিফোনে কথা কটি বলে তক্ষুনি গাড়ি নিয়ে বোধহয় বেরিয়ে পড়লেন। আর সত্যিই, মিনিট কুড়ির মধ্যেই তিনি এসে পড়লেন। তারপর তাঁর নির্দেশ মত বাকি ইটগুলো খুলে ফেলা হল।

সুনন্দ যা ভেবেছিল তাই। গহ্বরটা আসলে আগে ছিল একটা ওয়ার্ডরোব। যার ঘষা কাচের পাল্লা ইট ছাড়াবার সময় ঘা লেগে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গর্তের ভেতরে পড়ে গিয়েছিল তাই প্রথমটা দেখা যায়নি। দেখা গেল লোকটা ঠিক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই, হ্যাঙ্গার রডের সঙ্গে তাকে গোটাকতক তারের বাঁধন দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। গায়ের মাংস এবং পোশাক পচে গলে ঝরে যাবার

পর সেই তারের বাঁধনগুলো আলগা হয়ে গেছে। ফলে কঙ্কালটা সোজা দাঁড়িয়ে নেই, সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। সবচেয়ে কিম্ভুত দেখাচ্ছে দুটো জিনিস। বাঁ-হাতের কব্জির কাছে স্টেনলেসের ব্যাণ্ডের ঘড়িটা বালার মত ঝুলে আছে। স্কেলিমিটার পায়ে বুট জোড়া বিবর্ণ আর জীর্ণ হয়ে গেলেও এখনো অটুট আছে। দৃশ্যটা সহ্য করা কঠিন।

কমলেশকাকা চৌধুরীবাবুকে থানায় ফোন করতে পাঠিয়ে সুনন্দদের বললেন, 'এই বেলা খুব কাছ থেকে কঙ্কালটাকে একবার খুঁটিয়ে দেখে নাও তোমরা। এরপর পুলিস এসে গেলে আর বোধহয় সুযোগ পাবে না।'

আর বলতে হল না। অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ দেখার মত ওরা কাছে ঘেঁষে এল। বুকের ভেতরটা একটু শিরশির করছিল ঠিকই কিন্তু এখন আর ভয় করছিল না। অহনা পর্যন্ত সাহস করে দাঁড়িয়ে ছিল।

'বুঝতেই পারছো লোকটার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। মার্ডার করা হয়েছিল নিশ্চয়। কিন্তু কিভাবে খুন করা হয়েছিল আন্দাজ করার চেষ্টা কর দেখি।' কথাটা বলে কমলেশকাকা নিজেও মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। সবাই মনে মনে ব্যস্ত হয়ে রইল। কয়েক জোড়া চোখ কঙ্কালটার আপাদমস্তক তল্লাশী চালিয়ে গেল যেন।

কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ নয় যে কোনো ক্ষত স্থান চোখে পড়বে কিংবা মুখের চেহারা দেখে কিছু আন্দাজ করা যাবে। সামান্য ধস্তাধস্তি হলেও জামাকাপড়ে তার ছাপ থেকে যায়। কতকাল আগের একটা কঙ্কাল, শুধু তার হাড়গোড় দেখে সাদা চোখে যে কিছুই বোঝা যায় না ছাই। সমস্ত শরীরের অস্থিগুলো যতদূর বোঝা যাচ্ছে ভাঙেচোরেনি। যদি হার্টে গুলি বিঁধে থাকে, কি ছোরা, হাড়ে তার আঁচড়টুকুও লাগেনি। ডাণ্ডা দিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলে খুলিটা অবশ্যই ফাটতো কিংবা চিড় খেতো। বারবার চোখ বুলিয়েও সুনন্দ সে রকম কোনো চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারল না।

'কি ? কিছুই অনুমান করা গেল না তাহলে ?' কমলেশকাকা ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ওরা সবাই মাথা নাড়ল।

'আমিও কিছু অনুমান করতে পারছি না এখনো। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের শরণাপন্ন হতে হবে। ওরা নানারকম পরীক্ষা করে ঠিক খুঁজে বের করবে মৃত্যুর কারণ।'

'আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে।' সুনন্দ অনেক ভেবে চিন্তে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল।'

'বলে ফেল। তোমাদের তো বলতেই বলছি।'

'বিষ খাইয়ে, না না, ভুল হল, লোকটিকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।'

'কোনো প্রমাণ পেয়েছ, না নিছকই শুধু অনুমান।'

'মুখটা কেমন হাঁ করে আছে দেখুন। নিশ্চয় দম বন্ধ হয়ে জিভটা বেরিয়ে পড়েছিল। তাই মনে হয় না কমলেশকাকা ?'

কমলেশ রায় কোনো মন্তব্য করলেন না। সুনন্দর কথা শুনে কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। এমন সময় চৌধুরীকাকা ফিরে এসে বললেন, 'ও. সি. প্রথমে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। তারপর আপনার নাম বলতে যেন ঘুম ভাঙল। বললেন এক্ষুনি আসছেন।'

থানার ও. সি. সদলবলে এসে পৌঁছনোর পর কঙ্কালটিকে তারের বাঁধন মুক্ত করে খুব সন্তর্পণে বাইরে বের করে এনে শুইয়ে রাখা হল। কমলেশ রায় বললেন, তারের রিংগুলো যেমন আছে থাক, ফরেনসিক বিভাগের হয়তো কাজে লাগতে পারে। আপনি শুধু ওয়ার্ডরোবের তলাটা ভাল করে খুঁজে দেখুন, কোনো কিছু পাওয়া যায় কি না।'

'অল রাইট স্যার !' বলে নিজেই উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। বড় বড় কাচের টুকরোগুলো সরিয়ে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু মেঠো ইঁদুরের একটা গর্ত দেখতে পাওয়া গেল। দেখা গেল মেঝে ফুঁড়ে ইঁদুর বেশ কিছুটা মাটিও তুলে ফেলেছে। কিছু

খুচরো পয়সা আর একটা তামার ফ্রেমে বাঁধানো শক্তিশালী পাতলা কাচ পাওয়া গেল ওয়ার্ডরোবের মেঝে থেকে। আর কিস্যু না।

কমলেশকাকা বললেন, 'আই সী, মৃতের পকেটে যা ছিল তাই নিচে পড়ে গেছে। কাগজপত্র কিছু থেকে থাকলেও সেগুলো আর নেই, এত বছর ধরে পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে গেছে। মৃতদেহের গা-থেকে জামা কাপড় পচা মাংস ইঁদুরে আর পোকায় নষ্ট করে দিয়েছে। মুখে করে টেনে নিয়ে গেছে। বহুকালের পুরনো বাড়ি, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে।'

ও. সি. বললেন, 'কিন্তু লোকটি যে কে, কী তার পরিচয়, এ বাড়ির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, আর এই মর্মান্তিক ঘটনাটা কবেই বা ঘটেছিল, কতদিন আগে—এইসব প্রশ্নের উত্তর আমরা কোনোদিনই জানতে পারব না।'

'এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই তো হবে আমাদের কাজ।' কমলেশকাকা বললেন।

ফিতে দিয়ে মাপ জোক করে বোঝা গেল লোকটি ছিল মাঝারি হাইটের। পাঁচ ফুট দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি, লম্বা গড়ন, ছিপছিপে একহারা চেহারা অনুমান করা গেল। কিন্তু রং কালো না ফর্সা, মাথায় ঘন চুল অথবা টাক ছিল, পাকা না কালো চুল—অর্থাৎ যুবক না বৃদ্ধ কিছুই আর অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় হাড়ের গঠন ইত্যাদি দেখে বোধহয় বয়স নির্ণয় করা যাবে।

হাত ঘড়িটা খুলে নেওয়া হয়েছিল। স্টেনলেস ফ্রেমের এবং ব্যাণ্ডের ঘড়ি হলেও জং ধরে গেছে জায়গায় জায়গায়। ডায়ালটা এত অপরিচ্ছন্ন যে কিছুই প্রায় দেখা যায় না। ব্যাণ্ডের গায়ে পাতলা প্রায় ডাকটিকেটের সাইজের মেটাল ক্যালেণ্ডার সাঁটা। পেট্রল পাম্প থেকে যে রকম মান্থলি ক্যালেণ্ডার উপহার দেওয়া হত এক সময়। মিনি ডেট ক্যালেণ্ডার, এক মাসের তারিখ শুধু ছাপা থাকে তাতে।

সুনন্দ উবু হয়ে বসে বসে দেখছিল। ইস্কুলে কঠিন প্রশ্নের অঙ্কের সামনে বসে একগুঁয়ে সুনন্দ যেভাবে মাথা খুঁড়তে থাকে, এখন

একমনে সেইভাবেই এই নিরেট সমস্যার ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কোথায় সেই দুর্বল জায়গাটা, যেখানে আঘাতের পর আঘাত করে যেতে পারলে এই দুর্ভেদ্য প্রাচীরটাকে সে ফুটো করে ফেলতে পারবে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে সে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে কমলেশ-কাকার ডাক তার কানে পৌঁছালো না। একটা ছোট্ট শিশুর মতই সে তখন খুচরো পয়সাগুলো নাড়াচাড়া করছিল। দশ পয়সা পাঁচ পয়সা আর সিকি আধুলি নিয়ে প্রায় চোদ্দ পনেরটা হবে। বাবুয়া এসে ওর কাঁধ ধরে নাড়া দিল, 'অ্যাই বাবাই, বাড়ি যাবি না? চল, কমলেশকাকু ডাকছেন।'

বাড়িতে পৌঁছে কমলেশকাকা হাসতে হাসতে বললেন, 'সুনন্দ, তোমার কাছে কিন্তু আরও কিছু আশা করেছিলাম। ঠিক হোক, বেঠিক হোক তুমি আরও কিছু কথা বলবে এটাই আমি ভেবেছিলাম।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা কমলেশকাকা, কি বলব!'

'সে জন্যে দুঃখিত হবার কি আছে।' ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এটা তো কোন টাটকা খুনের ব্যাপার নয়। তাছাড়া তোমাদের চৌধুরীবাবুতো এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন, এ বিষয়ে অন্তত কোন সন্দেহ নেই। শুধু—'

'শুধু কি কমলেশকাকা?'

যদি সাল তারিখটা জানা যেত তাহলে হয়তো অপরাধীর কাছে আমরা পৌঁছাতে পারতাম। কিন্তু সেটা বোধহয় নিশ্চিত করে আমাদের অপরাধ বিজ্ঞানীরাও আর বলতে পারবেন না।'

'তারিখটা জানতে পারলেই হবে?' সুনন্দর মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে

কমলেশকাকা সেটা লক্ষ্য না করেই বললেন, 'তা হবে। বাকিটা তো পুলিসের রুটিন ওয়ার্ক। পুলিসের রিসোর্স, তাদের কানেকশনস, তাদের ক্ষমতা এবং এক্তিয়ার যে কত ছেলেমানুষ তুমি তা জানবে কি করে! কিন্তু অসাধ্য ব্যাপারটাই তো ওখানে!'

মাথা চুলকে সুনন্দ বলল, 'কঙ্কালের হাতের ঘড়িটা দেখেছেন ?'

'দেখেছি। তাতে সময় বার এবং তারিখ আছে, এই তো ?'

ইতস্ততঃ করে সুনন্দ বলল, 'হ্যাঁ।'

'সো হোয়াট ? তাতে কি প্রমাণ হয় ?' কমলেশকাকা অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'দিন সময় বার না হয় জানা গেল, কিন্তু কোন্ মাস কোন্ সাল তা কি করে জানা যাবে ?'

সুনন্দ মজা পেল। বলল, 'ব্যাণ্ডের সঙ্গে ক্যালেণ্ডার আছে, তাতে মাসের নাম জানা যাবে।'

'বেশ। বার সময় তারিখ এবং মাস না হয় জানা গেল কিন্তু ভাইটাল ব্যাপারটাই তো বাকি।'

কোন্ বছরের বার তারিখ মাস সেটা ? সেটাই তো আসল কথা, আসল গেরো।'

'হুঁ।' সুনন্দ বলল, 'খুব কঠিন প্রশ্নের অঙ্ক।'

কমলেশকাকা বললেন, 'অঙ্ক ? না, অঙ্ক আর কি করে বলি। অঙ্কের একটা সমাধান থাকে, উত্তর মেলানো থাকে। উত্তরবিহীন কোন অঙ্ক হয় না।'

'কিন্তু কাকু, এরও একটা সমাধান আছে, ঠিক আছে।'

'বলিস কি ?' কমলেশকাকা চমকে গিয়ে তুই বলে ফেললেন দেখে সুনন্দ বুঝতে পারল মনে মনে তিনি কতটা উত্তেজিত হয়েছেন।

'বল বল, উপায় কি সেটা বল, চুপ করে থাকিস না। আমি জানি আমাদের পাকা মাথার দোষ অনেক, সেখানে সব সময় সব থিওরী জট পাকিয়ে থাকে। আমাদের পুরনো চোখের নজর হচ্ছে বাই ফোকাল, সব সময় দু'রকম দেখে। তোদের তাজা চোখ কাঁচা মাথা, অনেক সত্য সহজে ধরা পড়ে। বল শুনি—'

সুনন্দ বলল, 'এবার তো শুধু ছক, ছক মিলিয়ে দেখুন।'

'কিসের ছক ?'

'পঞ্জিকার। মিলিয়ে দেখুন কত সালের ওই মাসে এবং ওই তারিখে ওই বার পড়েছিল।'

কমলেশকাকা চোখ বন্ধ করে মিনিটখানেক স্ট্যাচুর মত চুপ করে বসে থাকলেন, তারপর চোখ খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওয়াণ্ডার! ওয়াণ্ডার! তুই ব্যাটা আমাকে পাগল করে দিয়েছিস।' সুনন্দকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে হঠাৎ থেমে গেলেন কমলেশকাকা, তারপর হতাশভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'হল না, একটুর জন্যে হল না, সুনন্দ! কূলে এসেও ভরাডুবি হল, একটা ফাঁক থেকে গেল।'

'ফাঁক? কোথায় আমি তো বুঝতে পারছি না কাকু।'

'পাঁজির ছক তোর হয়তো জানা নেই, আন্দাজে বলেছিস, কিন্তু আমার মুখস্থ। প্রতি বছর একই তারিখের বার মাসে মাসে এগিয়ে যায় জানিস? প্রতি দ্বিতীয় মাসে একবার তিনদিন একবার দুদিন করে বার এগিয়ে যাবে। জানুয়ারীর যে তারিখ সোমবার, ফেব্রুয়ারীর সেই তারিখ বেস্পতি হবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারী যেহেতু ২৮ দিনে সেহেতু মার্চ মাসের ওই তারিখ পড়বে বেস্পতি বারেই। তারপরে এপ্রিলে রবি, মে মাসে মঙ্গল—এইভাবে। এটা গেল মাসের হিসেব। বছরের হিসেবে এই অঙ্কের নিয়মেই প্রতি বছর একদিন এগিয়ে যাবে বারগুলো। পিছনের বছরগুলোয় ফিরে যেতে হবে একটি করে বার পিছিয়ে আসবে ফি বছরে। বুঝলি?'

সুনন্দ ঘাড় নেড়ে জানাল সে বুঝেছে।

'এই ছক অনুযায়ী সাত বছর লাগবার কথা তারিখ সুদ্দু বারটা মিলে যাবার জন্যে। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতি চার বছরে লীপ ইয়ার হয়। ঐ বছরে ফেব্রুয়ারী মাস হয় আঠাশ দিনের বদলে উনত্রিশ দিনে। এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে লীপ ইয়ারের ফলে দুটি বছরের ব্যবধান একদিনের বদলে দু'দিন হয়ে যাচ্ছে। কঙ্কালের হাতঘড়ির তারিখ আর বার আমি পড়ে নিয়েছিলাম। ওটা ছিল সোমবার দশ তারিখ। আর অটোমোবাইলের মিনি ক্যালেণ্ডারে মাসটা ছিল অক্টোবর। তার মানে অক্টোবরের দশ তারিখ। এ বছর অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের অক্টোবরের দশ তারিখটা ছিল সোমবার। আজ নভেম্বরের

দু'তারিখ। বাইশ তেইশ দিনের মধ্যে যেহেতু একটা মৃতদেহ এরকম পরিচ্ছন্ন খটখটে কঙ্কালে পরিণত হতে পারে না সেহেতু চোখ বুজে বলা যায় হত্যাকাণ্ডটি এবছরে ঘটে নি, ঘটেছে আজ থেকে ছয় বছর আগে ১৯৭৭ সালের দশই অক্টোবর, সময় দুপুর অথবা রাত তিনটে পঁচিশ।'

সুনন্দ হাততালি দিয়ে উঠে বলল, 'অসাধারণ অ্যানালিসিস! এই জন্যেই আপনাকে আমি এত শ্রদ্ধা করি কমলেশকাকা! আপনি পাঁজি না ঘেঁটে মুখে মুখেই কেমন নির্ভুল তারিখটা বের করে ফেললেন। আমি তো এর মধ্যে ভরাডুবির কিছুই দেখছি না!'

কমলেশকাকা ওর উৎসাহে বাধা দিয়ে বললেন, 'ধীরে বৎস ধীরে। এত উল্লসিত হবার কিছু নেই! তাছাড়া এই ছক আবিষ্কারের কৃতিত্বও আমার নয়। সেটা তোর।'

'আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলাম।'

'তা ছুঁড়লেও ঢিলটা ঠিক মতই লেগেছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমরা বছরটাকে ঠিক পিনপয়েন্ট করতে পারছি না। ওটা সাতাত্তর না হয়ে একাত্তর কিংবা উনিশ শ'পঁয়ষট্টি হতেই বা বাধা কোথায়?'

সুনন্দর উল্লাস এবার চুপসে গেল। সে এতক্ষণে বুঝতে পারল তীরে এসে তরী ডোবা কাকে বলে!

কমলেশকাকা ফের বললেন, 'একটা নির্দিষ্ট তারিখ পেলে তবেই পুলিশের পক্ষে তত্ত্ব তল্লাশ করা সম্ভব। ঠিক সেই নির্দিষ্ট দিনে এই বাড়ির মালিক গজপতি গড়াই কোথায় ছিলেন কি করছিলেন, এ-বাড়িতে তখন আর কে কে ছিল এবং ওই সময়ের সমস্ত থানার পুলিস ডায়েরী, মিসিং স্কোয়াডের রেকর্ড, খবরের কাগজের নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন আর খবর ঘেঁটে মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করা যেতে পারত। কিন্তু ঘটনাটা যত বেশী বছরের পুরনো হবে ততই তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়বে।'

আরও অনেকক্ষণ পরে সুনন্দর বাবার সঙ্গে দু'দান দাবা খেলে আর গল্প করে কমলেশকাকা যখন ফিরে যাবার জন্য গাড়িতে স্টার্ট

দিয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তে সুনন্দ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল।

কমলেশকাকা তাড়াতাড়ি গাড়ির ইঞ্জিন চাবি বন্ধ করে বললেন, 'কি হয়েছে, হাঁপাচ্ছ কেন?'

সুনন্দ তিনতলার ছাদ থেকে ছুটে নেমে এসেছে, ভাল করে কথা বলতে পারছিল না। শুধু সংক্ষেপে বলল, 'হয়েছে।'

গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন উনি, তারপর বিস্মিত গলায় বললেন, 'কি হয়েছে?'

'ওটা ভেবে দেখলাম সাতাত্তর সালই হবে।'

'অ্যাঁ!' খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কমলেশকাকা বললেন, 'বল কী! কি করে তুমি এত নিশ্চিত হলে?'

সুনন্দ পকেট থেকে একটা কুড়ি পয়সার কয়েন বের করে ওঁর হাতে দিয়ে বলল, 'যতগুলো খুচরো পয়সা ওখানে পাওয়া গিয়েছিল এটাই তার মধ্যে কম বয়স!' এটা উনিশ শ' ছিয়াত্তর সালের। এ থেকে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে ছিয়াত্তর সালের আগে এই কয়েনটা পাওয়া মৃত ব্যক্তির পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না।'

এক মুহূর্তের জন্যে বাক্যহারা হয়ে গেলেন কমলেশকাকা। তারপর এক ঝটকায় অতবড় ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আনন্দে আড়াই পাক ঘুরে গিয়ে নামিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'সাবাশ! সাবাশ!'

লজ্জায় সুনন্দর মুখ চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো কেউ দেখে ফেলেছে কিনা।

কমলেশকাকা বললেন, 'কিন্তু বাবা এই কয়েন থেকে একজন পাকা চোরও ধরা পড়ে গেল এই মুহূর্তে।'

'কি করব!' সুনন্দ মাথা চুলকে বলে, 'কুড়ি পয়সার কয়েন যে আজকাল আর পাওয়া যায় না।'

ভণ্ডুল

ঠগ জোচ্চোর ছেলেধরা কিংবা ডাকাত নয়, ভূত প্রেত তান্ত্রিক কি পাগল হলেও কথা ছিল, সাদা বাংলায় যাকে বলে শখের গোয়েন্দা—স্রেফ তার পাল্লায় পড়ে আমার জীবন জেরবার হয়ে গিয়েছিল একদিন। আসলে শখের গোয়েন্দার মত রহস্যজনক এবং বিপজ্জনক চরিত্র খুব কমই আছে পৃথিবীতে। তাদের চাল-চলন মতিগতি সত্যিই দুর্বোধ্য, কখন যে কি করে বসবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার ওপর সে গোয়েন্দা যদি হয় ভণ্ডুল ভাদুড়ীর মত কেউ। লোকাল গুরু এবং গার্জেন, বন্ধু এবং একই সঙ্গে ছোটমামা। প্রাইভেট টিউটর কাম কোচ।

ছেলেবেলার কথা। ক্লাস সেভেনে কি এইটে পড়ি, ভাগ্যচক্রে পড়ে গেলাম ছোটমামার খপ্পরে। আমার থেকে কত আর, বছর চারেকের বড়, সদ্য কলেজে ঢুকেছে। খাসা ছেলে। ইস্কুলের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বয়েবখে যায়নি, বদ সঙ্গী জোটায়নি। অনেকে এই উঠতি বয়সে কবি-টবি হয়ে যায়, ছোটমামা সে লাইনেও যায়নি। তার মাথায় তখন অন্য ভূতে ভর করেছে, মনে মনে সে তখন সেণ্ট পার্সেণ্ট গোয়েন্দা। সেলফ্‌মেড শখের গোয়েন্দা। মগজে অষ্টপ্রহর রহস্যের পর রহস্য আর রহস্য ভেদের প্যাঁচ-পয়জার কাটাকুটি খেলছে। ঠোঁটে সব সময় একটা সবজান্তা হাসি। শুধু বুদ্ধিজীবী নয়, ফেলুদার স্টাইলের রীতিমত শীর্ষাসন ফিরশাসন করে। এ হেন ছোটমামার ঠিকেদারী-তদারকীতে আমার ঘরের জীবন বাইরের জীবন একাকার, ফিল্ডিং খাটতে খাটতে দিনের রাতের সময়-অসময় ফতুর। তবু তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই যে আজ আমি গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক হয়েছি, এ বিদ্যেয় হাতেখড়ি কিন্তু সেই তার কাছেই।

একটা ঘটনার কথা বলি।

রবিবারের দুপুরে বসে এক মনে হোম টাস্ক করছিলাম, এমন সময় কানের কাছে চাপা গলায় দৈববাণী হল, 'দমকলের মত তৈরি থাকিস, যে কোনো সময় ডাকতে পারি।'

চমকে ছোটমামার মুখের দিকে তাকালাম, 'কেন? কি ব্যাপার?'

'আছে···জোর খবর আছে।

'কী শুনি?'

'ক্রমশ প্রকাশ্য। একেবারে স্পটে গিয়ে নিজের চোখেই দেখবি।' বলেই গল্পের বইয়ের বিখ্যাত গোয়েন্দাদের মত তালাচাবি আঁটা মুখ করে বসে রইল। যেন এখন এই মুহূর্তে আর সে ইহজগতে নেই, ভাবখানা এমন। রাগ হল। এর আগেও দু-দুবার ওর খবর মাফিক অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে একেবারে আক্কেলগুড়ুম জব্দ হয়েছি। ফলস কেস! কোত্থেকে যে ছোটমামা সব ভুষি খবর যোগাড় করে আনে!

আমি ঠোঁট বেঁকিয়ে অস্ফুট গলায় বললাম, 'ওঃ খবর!'

'চোপ! অনেক ভাগ্য যে তোর মত একটা জলজ্যান্ত ইডিয়টকে অ্যাসিসট্যান্ট করে নিয়েছি!' ধমকের রেশ কাটলে নরম গলার গীয়ার বদলালো ছোটমামা, 'এ খবর সে খবর নয় রে ইস্টুপিড। এ একেবারে ফ্রম হর্সেস মাউথ—যাকে বলে ঘোড়ার মুখ থেকে পাওয়া, সুনিশ্চিত। সেন্ট পার্সেন্ট পাক্কা!'

ঘণ্টা দুই পরে এ গলি ও গলি ঘুরে আমরা স্পটে গিয়ে পৌঁছলাম। গ্রীষ্মের ভর দুপুর, রাস্তা জনমানব শূন্য। একটা চালঘরের আড়াল থেকে আমরা নজর রেখেছি গজ পনের কুড়ি দূরের একটা বড় বাড়ির দিকে। বারবার জিজ্ঞেস করেও স্পষ্ট কোন উত্তর পাইনি। মামা শুধু বলেছে, 'হবে, এক্ষুনি একটা কাণ্ড হবে। চোখকান খোলা রেখে শুধু দেখে যা।'

কিন্তু কোনোরকম কাণ্ড ঘটার লক্ষণই দেখি না। বড় বাড়িটার সামনের দিকের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ। দু একটা জানালার খড়-খড়ি শুধু সামান্য তোলা, যেন রোদের তাতের দিকে আধ খোলা চোখে

তাকিয়ে আছে। বাড়িটার সামনে রাস্তার ওপাশে সামান্য একটু পোড়ো জমিতে একটা ঝাঁকড়া মত পিটুলি গাছ আর ল্যানটেনা ধুতরোর ঝোপ। সেখানে একটা ভিখিরি মত লোক চটের বস্তা মাথায় দিয়ে গুটিসুটি ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া কোথাও কিছু নেই, কি দেখবো? ছোট মামা অবিশ্যি কিছুক্ষণ পরপরই হাতঘড়ি দেখছে, কিন্তু তার মুখ দেখেও মনে হচ্ছে সেও আমারই মত অধৈর্য আর হতাশ হয়ে উঠেছে। আমারও বিরক্ত লাগছে, থ্যাত্তোর, কোথায় কি তার ঠিক নেই, শুধু শুধু এরকম চোরের মত ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকা!

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম হুঁশ নেই, চোখের নজর হয়তো ঢিলে হয়ে গিয়েছিল, তাই বাড়ির সদর দরজাটা কখন নিঃশব্দে খুলে গেছে খেয়াল করিনি। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে একটা চাকর গোছের লোক বাইরে বেরিয়ে এল। লোকটার চাল-চলন কেমন ভীত সন্ত্রস্ত। সে ওপরের দিকে তাকাল, আমরাও। মনে হল দোতলার জানালার একপাট খড়খড়ি আস্তে আস্তে বুজে এল, রেলের সিগন্যাল যে ভাবে নেমে আসে। কোন রকম সংকেত? নিশ্চয়। কারণ লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিস দিল। শিসটা মোটেই জোরালো নয়, কিন্তু তাতেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। পিটুলি গাছের ছায়ায় ঘুমনো লোকটা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। মাথার বস্তুটি একটা বিরাট আকারের বস্তা, পিঠে ফেলে সে তিন লাফে বাড়ির সদরে হাজির। দেখে এখন মনে হল লোকটা মোটেই ভিখিরী টাইপের নয়, বেশ ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা। পাড়ায় পুরনো খবরের কাগজ কিনবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়, সেই ধরনের কেউ।

দুজনে মুখোমুখি। আমরা এপাশ থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম না, তবে মনে হল বাড়ির লোকটা পকেট থেকে কিছু বের করে ওর হাতে দিল। বোধ হয় টাকা। ঝোলা কাঁধে লোকটা অপ্রসন্ন গলায় বলল, 'আর'?

ঠোঁটে আঙুল রেখে বিরক্ত গলায় লোকটা বলল, 'চুপ! বাকি টাকা কাজ হাসিল হলে।'

কথাগুলো খুব আস্তে, কিন্তু শুনতে পেয়ে গেলাম। লোক দুটো চোরের মত ভিতরে ঢুকে গেল। ছোটমামা আমার হাতে একটা চিমটি কেটে চাপা গলায় বলল, 'এইবার দ্যাখ কি কাণ্ড হয়।'

আমিও ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। প্রতিটি সেকেণ্ডকে মিনিট মনে হচ্ছে, লোক দুটো ভেতরে ঢুকেছে তো ঢুকেছেই, বেরোবার আর নাম নেই। বাড়ির ভেতরে না জানি কি সাংঘাতিক কাণ্ডই হচ্ছে এতক্ষণে! আমার খুব ভালো ঠেকছে না। মামাকে সে কথা বলতে যাব, এমন সময় বস্তা পিঠে ফেলে লোকটা বাইরে বেরিয়ে আসতেই সদর নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। বস্তার ভারে লোকটা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। ওটার মধ্যে ভারি আর বড়সড় কিছু ভরা তাতে সন্দেহ নেই। রাস্তার দুপাশে একবার সাবধানী নজর বুলিয়ে নিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

আমি সন্দেহে-আতংকে আড়ষ্ট গলায় বললাম, 'ডেড বডি পাচার করছে মনে হয়।'

মামা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বলল, 'উঁহু। ছেলে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। চল সাবধানে পিছু নিতে হবে। লোকটা ঘুণাক্ষরে টের না পায়।'

নিজের মূর্খামি ধরা পড়ে গেল পরক্ষণেই। বস্তার ভেতরে কিছু নড়াচড়া করছে বোঝা যাচ্ছিল। থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল ওটা। সেই সঙ্গে চাপা গোঙানির মত কিছু যেন শুনলাম, সুতরাং ডেড বডি কি করে হবে। কোন ছোট ছেলেকে মুখ-হাত বেঁধে ভেতরে পুরে নিয়েছে, একটু ভাল করে নজর করলেই বোঝা যেত।

ছোটমামা আর আমি বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ছেলে ধরাটাকে ফলো করে চলেছি তো চলেইছি। পথ আর ফুরোয় না। লোকটা টের পেয়েছে কি না জানি না, চলার স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে, যে কোনো সময় ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে। অলিগলি রাস্তার কাটাকুটি খেলতে খেলতে যে ভাবে এগোচ্ছে, তাতে বোঝাই যায় ওর মতলব ভালো নয়, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ও ঠিক পালাবে। এদিকে

আমার পা আর চলছে না। রোদে-তাতে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসে পড়েছি আমরা। ছোটমামা এক সময় হাঁপ ধরা গলায় বলল, 'হুঁশিয়ার! ওকে এগোতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওই বড় রাস্তা যেই ক্রশ করতে যাবে অমনি আমরা ওকে ধরে ফেলব। ওখানে ট্রাফিক পুলিশ আছে, সাহায্য পাওয়া যাবে।'

যে কথা সেই কাজ। পিচ গলা বড় রাস্তার মাঝামাঝি আমরা ছুটে গিয়ে ওকে পেছন থেকে জাপটে ধরলাম। বেজায় চমকে গিয়েছিল লোকটা, কিন্তু সামলে নিতে দেরি হল না। আমাদের মত দুটো ছেলের পক্ষে অমন জোয়ান একটা লোককে কাবু করা শক্ত। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির মধ্যে আমি চেঁচালাম, 'পুলিশ, পুলিশ। পাকড়ো, পাকড়ো!'

ট্রাফিক পুলিশ বোধহয় আগেই লক্ষ্য করেছিল আমাদের ব্যাপারটা। সে বাঁশি বাজাতে বাজাতে ছুটে এল। কিন্তু তার পৌঁছনোর আগেই আমাদের দুজনকে এক ঝটকায় গরম পিচের ওপর ফেলে দিয়ে লোকটা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালালো। একটুর জন্যে হাত ফসকে পালাল বটে, কিন্তু ছেলেসুদ্ধু বস্তাটা সে নিয়ে যেতে পারেনি। ফেলেই পালিয়েছে। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

মামার মুখে সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনে পুলিশের তো চোখ কপালে ওঠার অবস্থা। দিনে-দুপুরে এই রাজধানীর বুকের ওপর ছেলেচুরি! একটা পুরস্কার কিংবা প্রমোশন তার কপালে নির্ঘাত নাচছে। সে কাল বিলম্ব না করে ঝটপট বস্তার মুখ খুলে ফেলল। আর তারপরেই ঘটে গেল সেই বিচিত্র কাণ্ডটা। কিছু বুঝতে পারার আগেই দেখলাম বিকট আর্তনাদ করে পুলিশটা রাস্তার ওপর উল্টে পড়ল, আর বস্তার খোলা মুখ দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে একটার পর একটা প্রমাণ সাইজের হুলো বেড়াল মর্টারের শেলের মত লাফিয়ে বেরতে লাগল। সাকুল্যে প্রায় এগারটা।

ততক্ষণে রাস্তায় হুলুস্থুলু কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। পিল পিল করে

রাস্তার দুপাশ থেকে লোক ছুটে আসছে আর বেড়ালগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে গিয়ে দিশে-হারার মত এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। মোটর বাস লরী আচমকা যে যেখানে পারছে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ছে একের পর এক। সমস্ত রাস্তা জুড়ে হৈ হৈ বিশৃংখলা।

কাঁ ভালে ছোটমামা আমাকে নিয়ে সটকে না পড়লে সেদিন পুলিশের হাতে আমাদের নির্ঘাত নাকাল হতে হত।

ভেতরের ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলাম ক'দিন পরে। বেড়াল-গুলো ছিল ওই বড় বাড়ির গিন্নীর পেয়ারের পোষ্য। ওদের জ্বালায় বাড়ির সবাই অতিষ্ঠ, কিন্তু মুখ ফুটে কারো সে কথা বলার সাহস নেই। ওই দজ্জাল মহিলাকে পাড়াপ্রতিবেশী থেকে শুরু করে বাড়ির কর্তা পর্যন্ত সভয়ে এড়িয়ে চলেন। শেষে অনেক মাথা খাটিয়ে কর্তা এক পুরনো কাগজওলাকে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে বেড়াল পাচারের ফন্দি বের করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরের দিনই বেড়ালগুলো আবার বাড়িতে ফিরে এসেছিল। আর এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী যে ভণ্ডুল ভাদুড়ীর গোয়েন্দাগিরি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জলযোগ

জীবনে যা কখনো হয় নি তাই হয়ে গেল, ফার্স্ট পিরিয়ডেই আমার আর শশাঙ্কর গাধার টুপি হয়ে গেল। হেড স্যারের নির্দেশে দপ্তরী মনমোহন পাঁড়ে আমাদের দুজনকে বিশুদ্ধ আনন্দবাজার দিয়ে তৈরী করা সেই রাজমুকুট পরিয়ে নীলামের মালের মত গোটা ইস্কুল চক্কর দিইয়ে নিয়ে এসেছিল। গার্ড অব অনার দেওয়ার মত প্রায় হেঁট মুণ্ডে আরষ্ট ঘাড়ে আর স্প্রিং-আঁটা অনিচ্ছুক পা টেনে টেনে স্বস্থানে ফিরে এসেও অবিকল ডবল প্রমোশন পাওয়ার মত রীতিমত উঁচু পোষ্টে আরোহণ করে লজ্জায় আধোবদন হয়েছিলাম। গাধার টুপি পরলে কারও মাথার ঠিক থাকে না, তার ওপর হাই বেঞ্চে উটের মত দাঁড়ানো!

আমাদের এই মরমে মরে যাওয়া অবস্থায়ও মান্‌কে ওরফে মামু কাটা ঘায়ে যাকে নুনের ছিটে বলে, তাই দিয়ে দিল। ঘণ্টা পড়তে হেড স্যার চলে যেতেই বেশ ভারিক্কে চালে হেড়ে গলায় ফোঁড়ন কাটলো, 'কোনো মানে হয়! রিয়্যাল গাধারা লাইফে কখনো টুপিই পরে নি, একথা ওঁদের জানা উচিত ছিল।'

মান্‌কের ন্যাকামি দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে গেলাম। ওর শয়তানী আর স্যারের সুনজরে পড়ার হ্যাংলামির জন্যেই আজ আমার আর শশাঙ্কর এই দশা একথা যেন জানতে কারও বাকি আছে। শশাঙ্কর জিভটা একটু ভারী, রেগে গেলে বিষম খায় আর তোতলাতে থাকে। ও রেগে গিয়েছিল, তাই হোঁচট খেতে খেতেই বলল, 'তো-তো-তোমাকে দেখেই সে-সে-সেটা বুঝতে পেরেছি!'

অর্থাৎ রিয়্যাল গাধাটা টুপি পরে নি? বিলাস অতি ভাল মানুষের মত মুখ করে জানতে চাইল। ক্লাস শুদ্ধু সবাই মান্‌কের

দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। আমাদের ক্লাসের এই গ্রেট মানিকচন্দ্রের ওপর ছেলেরা কেউ খুশী নয়। শচে চাপা গলায় বলল, 'তোরা চুপ করে বসে দেখ, মামুকে আজ হামু দেওয়াবো। ওর কি হাল করি শুধু দেখে যা'—

মান্‌কের কথা বলার আগে আজকের ঘটনাটা বলি। বিলাস একখানা লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের বই ইস্কুলে নিয়ে এসেছিল। ফোর্থ পিরিয়ডে আজ বিলাসের পেট কামড়াবে, ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যাবে স্থির হয়ে আছে, বইখানাও সেই সঙ্গে চলে যাবে। তাই শচে আমি আর শশাঙ্ক ইংরেজী গ্রামার বইয়ের ইজের পরিয়ে মানে মলাটখানা গল্পের বইয়ের ওপর চড়িয়ে গোগ্রাসে সেটা গিলছিলাম। গল্পের নায়ক তখন এক পোড়ো বাগানবাড়ির তিন তলায় জানলার শিক বেঁকিয়ে পরনের ধুতি বেয়ে সবে মাটির কাছাকাছি পৌঁছেচে এমন সময় একজোড়া ডালকুত্তা বিকট গর্জন করে ছুটে এল। আমাদের মাথার চুল ভয়ে আর উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠেছিল। খেয়াল করি নি আমাদের সামনের বেঞ্চে বসা মানিক একটু সরে বসে আড়াল ছেড়ে দিয়েছে আর থেকে থেকে হাসি মুখে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দেখছে। অর্থাৎ যাতে হেড স্যারের চোখে পড়ে যায়। যা চেয়েছিল তাই হল। হেড স্যার হুকুম করলেন, 'কি বই অমন মনোযোগ দিয়ে পড়া হচ্ছে, দেখি নিয়ে এস।'

দৈবাৎ একরম ঘটনা ঘটতে পারে ভেবে শচে আগে থেকেই তৈরী ছিল। সে সত্যিকারের গ্রামার বই রেডী রেখে ছিল। সেটা নিয়ে উঠে যেতে যাচ্ছে, তার আগেই মান্‌কে খপ্‌ ক'রে গল্পের বইখানা নকল মলাট শুদ্ধু টেনে নিয়ে হেড স্যারের হাতে তুলে দিল। তারপরের অনিবার্য ঘটনাটুকু ঘটতে বিলম্ব হল না, তবে দৈবক্রমে শচীন বেঁচে গেল। আমি শশাঙ্কই অপরাধী সাব্যস্ত হলাম, আর মান্‌কে প্রশংসা কুড়োলো।

তা কুড়োক, কিন্তু এই শয়তানী আর গায়ে জ্বালা ধরানো ফোড়নকাটার জন্যে ওকে আর কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

এমনিতেই দিনের পর দিন মানিক আমাদের তিতিবিরক্ত ক'রে রেখেছিল। এবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।

কলকাতার বোধহয় হাফ ডজন ইস্কুলে মুখ বদলে গ্রেট মানিক চন্দ্র শেষে এই মফস্বল ইস্কুলে এসে ক্লাস টেনে পায়ের ধুলো দিয়েছিল। কিন্তু সেকথা পরে জেনেছি। আসলে কলকাতার নামই শোনা ছিল, এতদিনে খাস কোলকাত্তাই ছেলে এই প্রথম চোখে দেখলাম। একটা অতিকায় লাট্টুর মত ঢাউস চেহারা, পেট বুক মাথা একাকার হয়ে যেন হেড স্যারের ঘরে রাখা গ্লোবটি—পা দুখানা সরু, চোঙা প্যাণ্টে লাট্টুর আলের মতই সরু দেখায়। লাট্টু, কিন্তু দমিয়াল লাট্টু, বোলচালবকুনিতে সকলকে অস্থির করে দেয়, তাকে দমিয়ে রাখা শক্ত। ক্লাসে একসঙ্গে পড়লেও আমাদের সে যেন মানুষের মধ্যেই গণ্য করতো না। কথায় কথায় উপদেশ দিত আর চাঁটা মারতো, 'বাঁকড়ী না হলে আর তোদের এমন বুদ্ধি!'

অথচ এই বাঁকড়ী আমাদের টিফিনে ভাগ বসিয়ে, আমাদেরই পকেটের রুমালে হাত মুছে দিনের পর দিন বেশ চালাচ্ছে। বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানো বোধ হয় একেই বলে। আমাদের নতুন কলম দেখলেই কেড়ে নিয়ে লিখতো, ফস ফস ক'রে আমাদেরই খাতার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার প্রতিদিন ছুটির দরখাস্ত রচনা হত। অথচ আমরা কিছু বলতে সাহস করতাম না। কলকাতার ছেলে বাবা, ঘাঁটিয়ে কি দরকার! শুধু আমরা কেন, ভালমানুষ স্যারেরাও ওকে বিশেষ নাড়াচাড়া করতেন না, যা মুখ ওর, কি বলতে কি বলে বসবে তার ঠিক কি! হাজার হলেও বয়স্ক ছাত্র, বয়েসের একটা সম্মানে তো ওর প্রাপ্য আছেই। যেভাবে প্রতিদিন শেভ করে আসে, যে সাইজের ঝুলফি রাখে এবং যে হারে তার গা থেকে সিগারেটের খোশবু ছাড়ে তাতে মানিকচন্দ্রকে একটু নাগালের বাইরে রাখাই তাঁরা কর্তব্য জ্ঞান করতেন। কিন্তু কঠিন জায়গায় মানিক ছিল ভেতরে ভেতরে কেঁচো, হেড স্যার, অঙ্ক স্যার কিংবা বিভীষিকা স্যারকে সে তলায় তলায় অয়েল করে চলতো। এসবই আমরা পরে জেনেছি। আসলে

মানিকচন্দ্র মুখুটি সংক্ষেপে মামু প্রথম বিখ্যাত হয়ে যায় ইতিহাস স্যারের কল্যাণে। ক্লাসে আর একজন মানিক থাকায় তিনি ওকে ডাকতে শুরু করেছিলেন গ্রেট মানিকচন্দর বলে। এই গ্রেটনেসের পরিচয় আমাদের তিন বন্ধুকে হাড়ে হাড়েই পেতে হচ্ছে। চিউইংগামের আঠার মত মামু আমাদের গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, ইস্কুলে শুধু নয় ইস্কুলের বাইরেও, খেলার মাঠে, আমাদের গল্প গুজবে আড্ডায় সর্বত্র। সন্ধ্যেবেলায় শচেদের দোতলার একটেরে ঘরখানায় আমাদের গল্পের আসর বসে। শহরে শচেদের নামকরা খাবারের দোকান আছে। সেখান থেকে চাঙাড়ী ভর্তি করে রোজ ঘিয়ে-ভাজা ডবল সাইজ সিঙাড়া আর স্পেশাল কচুরি আসে, আসে আদা দেওয়া চা; আর সেই গন্ধে গন্ধে আসে মানিক দি গ্রেট। এসে সেঁটে যায়, নানারকম বোলবুকুনি ঝাড়ে আর চাঙাড়ীর ভেতরের বিষয়বস্তু অর্ধেকের বেশীটাই একা সাঁটিয়ে যায়। কিছু বলাও যায় না, শচেদের ক'খানা বাড়ির পরেই মানিকের মামার বাড়ি, ওর মামা আবার ছোটকার হালের বুজুম ফ্রেণ্ড, এই শহরের ডি-এস-পি। খোদ পুলিশ অফিসারের ভাগনে। ও আসছে দেখলেই শশাঙ্ক হতাশ গলায় বলে, 'ওই রে! ঐক্যবাক্যমাণিক্য এসে গেল!'

কথাটার আসল চেহারা একটু ভেঙে বললে চেনা যায়। কথাটা হচ্ছে ঐক্যবাক্যমাণিক্য, অর্থাৎ ঐ কটি বাঁধা বাক্য বা বুলি, যা প্রতিদিন শুনতে শুনতে আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তবে এটা ঠিকই, মানিক মুখুটি সত্যিই মুখ সর্বস্ব, কথায় তার জুড়ি নেই। এই তো গত পরশু দিনের ঘটনা। সংস্কৃতের সশস্ত্র স্যার (সব সময়েই তাঁর হাতে একগাছা গাঁটাল লাঠি থাকে) ছোটরাম পণ্ডিত মশাই মানিককে বেঞ্চের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো ছেলের অনুস্বর বিসর্গ জ্ঞান নেই দেখলে তিনি রেগে অজ্ঞান হয়ে যান। ঘা কতক সেই যষ্টিমধু দিয়ে বলেন, 'বাবা স্বর্গে ওঠো।'

তা গাঁটতোলা যষ্টিমধু সেবন করে মানিক বেতরূপী স্বর্গ লাভ করেছিল, কিন্তু মুস্কিল হয়েছিল সোজা হয়ে, বেশীক্ষণ দাঁড়াতে

পারছিল না। মানিক ভুল ক'রে বেল্ট পরে আসে নি সেদিন। ফলে লাট্টুর মত পেটের কাছ থেকে ওর টেরিলিনের প্যাণ্টুলন ফস্কা লেত্তির মত সড়াৎ ক'রে ক'রে কোমরের তলায় নেমে আসছিল আর মানিক প্রতিবারই সুদক্ষ খেলোয়াড়ের মত নিচু হয়ে ক্যাচ লুফে তুলে আনছিল। এই দৃশ্যে ছোটরাম পণ্ডিত বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস মানিক, তুমি যদি উর্ধ্বগামী হয়েছ তোমার প্যাণ্টুলন অমন নিম্নমুখী হতে চাচ্ছে কেন?' উত্তর দিতে মানিককে এক সেকেণ্ডও বুঝি ভাবতে হলো না। পাঠ্যকেতাবের বাইরে বরাবরই সে খুব স্মার্ট।

'সঙ্গ দোষ, স্যার!'

'তার মানে?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছোটরাম পণ্ডিত গর্জে উঠলেন।

মানিক গাঁটাল লাঠিখানার দিকে তাকিয়েও কিন্তু ঘাবড়ালো না। বলল, 'আমারই তো প্যাণ্ট, স্যার। ও-ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইছে।'

ছোটরামবাবু এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন যে অন্য ছেলেদের পড়া ধরতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন, মানিককে আর কিছুই বলেন নি।

এহেন মানিককে আমাদের শচীন যে সত্যিই কিছু কায়দা করতে পারবে বিশ্বাস করতে পারি নি। খাস কলকাতার ছেলেকে বাঁকুড়ার মত এক ঘোর মফস্বল শহরের ছেলে বুদ্ধিতে কাত করে দেবে তখনও পর্যন্ত ভাবা যায় নি।

দুটো পিরিয়ড বিনা ঘটনায় চলে গেল। আমি আর শশাঙ্ক ততক্ষণে সামলে উঠেছি গাধার টুপির সম্মান মোটামুটি হজম করে ফেলেছি, গরম হয়ে ওঠা কানের রঙ আবার কখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। টিফিনের আগের পিরিয়ড। খুব মারাত্মক ঘণ্টা, কারণ এই ঘণ্টায় বিভীষিকা স্যারের ক্লাস। নামটা আড়ালে ছাত্রদেরই দেওয়া, বছর বছর ধরে চলে আসছে। উনি আসলে ভূগোল স্যার, কিন্তু ভূগোলও যে কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে সেকথা জানতে

ভূগোল-স্যার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বাগ মশাইয়ের ক্লাস একদিন করাই যথেষ্ট। এরকম বদমেজাজী একগুঁয়ে মাস্টারমশাই আমরা দুটি দেখি নি। ইস্কুলের মোট কিল চড় রামচিমটি এবং বেতের অর্ধেক স্যার একাই যোগান দিয়ে থাকেন। অন্য স্যারেরা নিজেদের মধ্যে যে বিভূতিবাবুকে বাঘমশাই বলে ডাকেন, ঠিকই ডাকেন।

তো সেই বাঘমশাই ক্লাস নিচ্ছেন। দেওয়ালে মানচিত্তির ঝুলিয়ে শঙ্করমাছের ল্যাজের মত লিকলিকে লম্বা একগাছা ছড়ি হাতে নিয়ে ভূগোলের স্থানমাহাত্ম্য বোঝাচ্ছেন, ছেলেরা সব কাঁটা হয়ে আছে। এমন সময় মানিক উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে ছোটবাইরে যাবার অনুমতি চাইল। ও জল খেতে যেতে চাইলে আমরা খুশি হতাম। কিন্তু ওর ভাগ্য নিতান্তই ভাল বলতে হবে, কারণ ছোটবাইরে যেতে চেয়েছে। করমচার মত লাল চোখ মেলে কিছুক্ষণ ওকে পর্যবেক্ষণ ক'রে বিভীষিকা স্যার তাঁর বেয়োনেটের মত দীর্ঘ নাক দিয়ে একটা দুর্বোধ্য শব্দ করলেন। এ শব্দটা সকলেরই চেনা, অর্থাৎ ছুটি মঞ্জুর।

পিছনের দরজার কাছের বেঞ্চে বসে শচে সব লক্ষ্য করছিল। মানিক ওর নাকের ডগা দিয়ে নেপোলিয়ানের মত বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় ঠোঁটের কোণে এক চিলতে বাঁকা হাসি হেসে যেন বুঝিয়ে গেল, আমাকে তুই কাঁচকলা করতে পারলি, শচে!

ভূগোল স্যার মানিকের ছুটি মঞ্জুর করেই আবার পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে ছড়ি সুদ্ধু মুখ ঘুরিয়েছিলেন, শচীন সেই সুযোগে ক্লাসরুম থেকে টুকুস ক'রে বেরিয়ে গেল। আমি উঁকি মারলাম ভয়ে ভয়ে। কী জানি বলা যায় না, হয়তো মানকের সঙ্গে হাতাহাতি বাধাতেই গেল। কিন্তু না, শচীন অতদূরে গেল না। করিডোরে নিচের ক্লাসের একটা ছেলেকে ধরে কি যেন বোঝাচ্ছে মনে হল। একটু বাদেই দেখি শচীন ফিরে এসে কখন মাঝের একটা বেঞ্চে গুটিসুটি মেরে বসে গেছে। ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না, তবে কেমন গোলমেলে ঠেকলো। অকারণে এতবড় ঝুঁকি নেওয়া বোকার মত কাজ হয়েছে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, আর আমাদের বাগ স্যার

ছুঁলেও তাই! যাকেই ধরেন, প্রথমে পেটে সাঁড়াশির মত রামচিমটি কাটেন আর চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, 'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা বুঝলি। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা!'

আর সত্যি সত্যি শঙ্কর মাছের লেজের মত মারাত্মক ছড়িটা দিয়ে গুণে গুণে একটাও কম না বেশী না, ঠিক আঠারটি ঘা কষান। কষিয়ে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড করে ছাড়েন! তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে একখানা আগ্‌মার্কা হাসি হেসে বলেন, 'এভাবেই আমি ব্লাড টেস্ট করে থাকি, বুঝলে?'

এই সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মত বিভীষিকা স্যারেরও একটা গোপন দুর্বলতা ছিল। একদিন ম্যাপে কালিকট বন্দর দেখাতে গিয়ে আমার আঙুল একটু কেতরে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্যার এমন আঁতকে উঠেছিলেন যেন আমি আরব সাগরের জলে পড়ে গিয়েছি। খটকা লাগায় ব্যাপারটা যাচাই করে দেখার জন্যে শচীনকে টিপে দিলাম। জাপানের ইয়াকোহোমা দেখাতে গিয়ে শচে তার ডান হাতের গোটা পাঞ্জাটাই প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবিয়ে বসলো। স্যারের মুখ দিয়ে শুধু অ্যাঁও করে একটা আর্তনাদ বেরলো। তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ঠিক পাঞ্জাবী বাস কণ্ডাকটারের মতই একহাতে শচীনের কোমর জড়িয়ে ধরে অবলীলায় শূন্যে তুলে ফেলে সে যাত্রা অ্যাকসিডেণ্ট বাঁচিয়ে দিলেন যেন। সেই থেকে ম্যাপপয়েন্টিংয়ের বিপজ্জনক ধাঁধা থেকে আমরা কয়েকজন রেহাই পেয়ে গেলাম। বুঝলাম মানুষমাত্রেরই ছিট থাকে। স্যারও মানুষ, কাজে কাজেই তাঁর মাথাতেও ছিট থাকতে বাধ্য। অনেকেই অনেক কিছু সইতে পারে না। অ্যালার্জী হয়। যেমন ছোটকা কাগজ কিংবা টিনের উপরে নখ আঁচড়ানোর শব্দ একদম সইতে পারে না। শচীনের মেজদির নাকি কাঁকড়া কিংবা চিংড়ি মাছ রান্নার গন্ধ নাকে গেলেই গায়ে চাকা চাকা ফোস্কা দেখা দেয়। বিভীষিকা স্যারের তেমনি, একটু বাড়াবাড়ি রকমের জলাতঙ্ক ব্যামো আছে, জল দেখলেই তাঁর জান জেরবার হয়ে যায়। পৃথিবীর চেয়ে স্যাস্টি প্লেস নাকি আর নেই,

কারণ তার তিন ভাগই জল। কেন রে বাপু, তোর একভাগ মাত্র জল থাকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত। পরে পরে আরও জেনেছি। সেটা শীতকাল ভর স্যার চান করেন না। গ্রীষ্মকালেও অনেক কদিন বাদে বাদে ছিটেফোঁটা জল ছেটান, মাথায় বড় জোর চন্নমেত্য ঠেকানোর মত এক আঁজলা জল ছোঁয়ান। দরকার পড়লে তিনি আইসব্যাগই প্রেফার করেন। এবং সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার তাঁর নাকি আজ বারো বছর কোনো পিপাসা হয় না। ডাক্তারের নির্দেশে দিনেরাতে একবার, ঠিক দুপুর দুটোর সময় চোখনাক বুজে ওষুধ গোলার মত করে পরপর ছ গেলাস জল গলাধঃকরণ করেন।

হঠাৎ বেজায় চমকে গিয়ে দেখলাম মানিকচন্দ্র দুহাতে দুটি কাঁচের গ্লাস ভর্তি জল নিয়ে ক্লাসে ঢুকলো। ঢুকে নিজের জায়গায় গেল না, সোজা স্যারের চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল, 'স্যার আপনার জন্যে জল এনেছি।'

ব্যাস ক্লাসে বুঝি অ্যাটম বোমা ফাটল! এর পরের ঘটনা আর কহতব্য নয়। আর কোনদিন সে আমাদের সঙ্গে লাগতে আসে নি।

ভূতে মানুষে

একে ইস্কুলে পুজোর ছুটি পড়ে গেছে, তার ওপরে বাড়ি খালি। বড়রা সবাই দল বেঁধে থিয়েটার দেখতে গেছেন। আমাদের বৈঠকখানায় তাই অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে আড্ডা জমেছে। মোহন বেশ রঙ চড়িয়ে ভূতের গল্প ফেঁদেছে।

লোড-শেডিংয়ের কল্যাণে বাদলা সন্ধেটা আপনা থেকেই ভুতুড়ে হয়ে উঠেছিল। একটু আগেই জোর এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে আকাশ এখন জিরেন নিচ্ছে। বাইরেটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ঘরের ভেতরেও আলো-ছায়া, থেকে থেকে কাঁপছে। একটি মাত্র মোমের আলোয় আমাদের মুখগুলো কৌতূহলে ছমছম করছে।

গল্পের রসে আমরা প্রায় মজে এসেছি এমন সময় ফন্টেদা ঘরে ঢুকে ছন্দপতন ঘটাল। "কী সব থার্ডক্লাসের গপ্পো চালাচ্ছিস। ফুঃ, ভূত এ-যুগে অচল, সে নিজেই কবে মরে ভূত হয়ে গেছে, তা জানিস?" কথাটা বলে কোঁচা বগলে বাবু ফন্টেদা আমার পাশে বসে পড়ল।

এইরকমই একটা আশঙ্কা এতক্ষণ আমার মনের মধ্যে ছিল। আড্ডার গন্ধে-গন্ধে ফন্টেদা ঠিক এখানে এসে হাজির হবে, আর তাই হল। কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি আমাদের আসরে ও ধূমকেতুর মতো এসে পড়ে সব চুরমার করে দেয়। যে বিষয় নিয়েই তর্ক হোক কিংবা আলোচনা, গল্প হলে তো কথাই নেই—সবজান্তা ফন্টেদার ঠাট্টা-বিদ্রূপের গুঁতো খেয়ে আমাদের চুপ করে যেতে হয়। ফন্টেদা মুখ খুললে আর কাউকে কথা বলতে হয় না, সে একাই একশো। দুনিয়ায় জানে না এমন বস্তু নেই সব বিষয়েই যাকে বলে এক্সপার্ট। কথার মারপ্যাঁচেই যদি আমাদের শুধু কোণঠাসা করে রাখত, তাহলে

কিছু বলার ছিল না। কিন্তু সে আমাদের বড়ই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, আমাদের কোনো যুক্তিকেই যুক্তি বলে মনে করে না। সব কিছু বুড়ো আঙুলে নস্যাৎ করে দেয়। ক্লাস টেনে উঠেই তার এত ডাঁট আমাদের ভাল লাগে না। আমরা পড়ি ক্লাস এইটে—তার ভাষায় থার্ড ক্লাস। থার্ড কথাটাকে কেমন ধিক্কার দিয়ে উচ্চারণ করে ফণ্টেদা, যেমন আজ করল: কী সব থার্ড ক্লাসের গপ্পো চালাচ্ছিস! আমাদের সবই থার্ড ক্লাস, আর তোমার ফাস্ ক্লাস, বেশ আছ!—আমরা মনে-মনে ক্ষোভের সঙ্গে বলি।

মোহনের মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল, "তুমি কি বলতে চাও ভূত নেই?"

আক্রোশই হোক বা কটাক্ষই হোক মোহনের ওপর সেটা একটু বেশি ফণ্টেদার। মাথায় প্রায় গাঁট্টা বসিয়ে দেবার ভঙ্গিতে ফণ্টেদা বলল, "ভূঃ! ওসব ভুশুণ্ডির মাঠের ব্যাপার ভুলে যা, মুহুনে! আজ-কালকার ছেলে-ভোলানো গপ্পেও ওই ট্র্যাশ ভূতের কোনো পজিশন নেই। তবে হ্যাঁ, আত্মা হচ্ছে রিয়্যাল থিং—আমার প্ল্যানচেটের অভিজ্ঞতা থেকে তোদের বলতে পারি।"

ফণ্টেদা আমাদের কাছে খুব প্ল্যানচেটের কথা বলে। প্রায়ই বলে, আজ ওঁকে নামালুম, কাল তাঁকে নামালুম। বিখ্যাত-বিখ্যাত লোকের আত্মার সঙ্গে ওর নাকি দোস্তি হয়ে গেছে। আমাদের কেমন সন্দেহ হয়, আবার পুরো ব্যাপারটা অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিতেও পারি না। এত খুঁটিনাটি বর্ণনা কি কেউ বানিয়ে বলতে পারে?

"আত্মা যদি থাকে তাহলে"—মোহনের কথা শেষ হবার সুযোগ পেল না। বিপুল হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজার পাশের আলমারিতে ঠোক্কর খেয়ে আর একটু হলেই সে পড়ে যেত। হাঁপাচ্ছিল বিপুল, মনে হয় এই অন্ধকারের মধ্যেও অনেকটা পথ সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে। একটু দম নিয়ে বলল, "এই যে তোরা! শুনেছিস ওদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে?"

সর্বনাশ! সবাই চটকা ভেঙে যেন খাড়া হয়ে বসল। আমি

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় ? কী হয়েছে !"

আমার পাশে সোফার ওপরে ধপাস করে বসে পড়ে বিপুল দুহাতে মুখ ঢাকল। সবাই হতবাক, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, এমন সময় কান্নাজড়ানো গলায় ও বলল, "অমল আর নেই !"

মানেটা বুঝতে আমাদের কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল। বিপুলের মাসতুতো ভাই অমল আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গত পরশু দিনও ক্লাবে এসে আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে গেছে। কাল ভোরে অমলরা দেশে চলে গেছে বলেই জানি। ওদের দেশের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয় তাই পুজোর সময় কোনোবারই ও কলকাতায় আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে না।

ফণ্টেদা চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজনায়, "অমল নেই মানে !"

বিপুল আর কথা বলতে পারছিল না, হাতে মুখ ঢেকেই সে বসেছিল। কোনো রকমে পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা কাটিং বের করে আমার হাতে দিল। আমি উঠে গিয়ে মোমবাতির তলায় সেটা মেলে ধরলাম। সবাই ছুটে এসে আমার চারপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এক কিশোরসহ সাতজনের সলিল সমাধি—এই হেডিংয়ের তলায় ছোট্ট একটুখানি খবর ছাপা হয়েছে। ডায়মণ্ড হারবারের কাছে গতকাল বানের মুখে পড়ে একটি নৌকাডুবি হয়েছে। মৃত যাত্রীদের নামের তালিকায় অমল দত্তর নামটিও আছে। বয়স চোদ্দ।

আমরা বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। ডায়মণ্ড হারবারের কাছে নৌকোয় নদী পার হয়েই অমলদের যেতে হয়। সত্যি এমন মর্মান্তিক ঘটনা ভাবাই যায় না। বিপুলের কাছ থেকে শুনলাম অমল কাল একাই গেছে, ওর বাবা কী একটা কাজে আটকে যাওয়ায় আগামী কাল যাওয়ার কথা ছিল।

"ওঃ মাগো !" বিপুল হঠাৎ ডুকরে উঠল, "আমি আর ভাবতেই পারছি না !"

আমরা সবাই ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম, কিন্তু ও কিছুতেই মুখ থেকে হাত সরাল না, কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

তবে হ্যাঁ, আত্মা হচ্ছে রিয়্যাল থিং

প্রস্তাবটা মোহনই দিয়েছিল। সেই সঙ্গে আমরা সবাই চেপে ধরায় ফণ্টেদা অনেকক্ষণ গাঁই-গুঁই করেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। ব্যাপারটা এতই করুণ আর সেন্টিমেন্টাল যে ফণ্টেদার পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। শেষবারের মতো আমরা সবাই অমলের সঙ্গে কথা বলতে চাই। প্ল্যানচেটের কথায় বিপুল কান্না থামিয়ে চোখ বড়-বড় করে শুধু তাকিয়েই নেই, এ ব্যাপারে এখন বুঝি তার উৎসাহই সকলের চেয়ে বেশি।

মিনিট-পনেরোর মধ্যেই সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ফণ্টেদা যেমন-যেমন বলেছিলেন সব জিনিস তেমন-তেমন যোগাড় হয়ে গেল। একটা হালকা তেপায়া টেবিল ঘিরে ফণ্টেদা, মোহন, বিপুল আর শচীন গোল হয়ে বসল। সামনের বড় টেবিলের ওপর একগোছা ধূপকাঠি আর একটা নতুন মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হল। আমি একটু তফাতে খাতা-পেনসিল নিয়ে বসলাম, সংকেত নোট করে বাংলায় তর্জমা করে ফেলার জন্য।

ফণ্টেদা বলে দিয়েছিল সবাই টেবিলের ওপর হাত রেখে এক মনে অমলকে স্মরণ করতে থাকবে। নড়াচড়া করা কিংবা কথা বলা একদম বারণ। আত্মা এসে গেলে টেবিলটা নড়ে উঠবে, শব্দ হবে। তখন ফণ্টেদা নিজে তাকে প্রশ্ন করবে। তার আত্মার শরীর নেই, মানুষের গলায় সে কথা বলতে পারবে না। উত্তর দেবে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার মতো ঠক্-ঠক্ শব্দ করে। এক-একটা শব্দ এক-একটা সংখ্যা। যেমন পর-পর তিনটে শব্দ হলে বুঝতে হবে তিন। কিন্তু তিন কোনো ভাষা নয়, ভাষার জন্য চাই অক্ষর। অতএব তিন হবে ইংরেজি সি অক্ষর, চার-পাঁচ-ছয় যথাক্রমে ডি-ই-এফ। এইভাবে সংখ্যা গুনে গুনে অক্ষর বসাতে হবে। ইংরেজি অক্ষর দিয়ে বাংলা বানান লেখা হবে, মানে আত্মা কথা বলবে বাংলায়, তাকে প্রশ্ন করাও হবে বাংলায়। যেমন এ এম আই—এই তিনটে ইংরেজি অক্ষর সাজালে হবে বাংলায় 'আমি'।

আমার কেমন ভয়-ভয় করছিল। সত্যি-সত্যি আত্মা এসে সামনে

দাঁড়াবে, কথা বলবে, এ যেন ভাবাই যায় না। অমল আমাদের বন্ধু ছিল ঠিকই কিন্তু এখন সে মৃত, এখন সে ভূত, মানে আত্মা। এখনও তার গায়ে মৃত্যুর গন্ধ লেগে আছে। এখন কি সে আর আমাদের বন্ধু? আমার কেমন গা ছমছম করতে লাগল। কী জানি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে!

মিনিট-দশেক চুপচাপ রুদ্ধ নিশ্বাসে কাটল। ঘরের মধ্যে একটা ছুঁচ পড়লেও বোধহয় শব্দ শোনা যাবে। অমলকে আমরা মনে মনে ডাকছি, কিন্তু ও আসছে না, আসতে বড্ড দেরি করছে।

হঠাৎ আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে টেবিলটা খট-খট শব্দ করে উঠল। আর একটু হলেই আমার হাত থেকে পেন্সিলটা পড়ে যেত। সামলে নিলাম।

ফণ্টেদা অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে? কে এসেছ?"

"আমি অমল।"

"কেমন আছ অমল?"

"ভাল।"

"এখানে আসার আগে তুমি কোথায় ছিলে? স্বর্গে?"

"না। আমি এখনো পৃথিবী ছেড়ে যাইনি।"

"যাওনি?"

"না। তোমাদের খুব কাছাকাছিই আছি। আরও কিছু দিন থাকব।"

"তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না?"

"কেন?"

"আমাদের জন্যে?"

"হ্যাঁ। খুব।"

"অমল, আমাদের সব্বাইকে তুমি দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার কি কিছু বলবার আছে, অমল? বিশেষ কোনো কথা?"

"আমাকে নিয়ে তামাশা হচ্ছে অ্যাই ফণ্টে!"

আমার পিলে চমকে গেল, মনে হল বুকের ভেতর একটা রবারের বল লাফিয়ে উঠল। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে চমকে তাকালাম। অমলের গলায় এই শেষ কথাটা কেউ খুব কাছ থেকে যেন বলল। ধূপের ধোঁয়ায় ঘরটা ঝাপসা হয়ে আছে। চোখে যেন হোঁচট খেলাম। হাত-পাঁচেক তফাতে ঠিক অমল দাঁড়িয়ে আছে। উসকো-খুসকো চুল কপাল ঢেকে ফেলেছে। মুখখানা মড়ার মুখের চেয়েও সাদা। যেন পাউডার দিয়ে চুনকাম করা।

সেই মুহূর্তে চোখ ঝলসে দিয়ে ঘরের আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গোঁ-গোঁ গোঙানি, আর তার পরেই হুড়মুড় ধপাস। তাকিয়ে দেখি ফণ্টেদা অজ্ঞান হয়ে চেয়ারসুদ্ধু উলটে মেঝের ওপর পড়ে গেছে।

বিপুল "আউট! আউট!" বলে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। অমল এগিয়ে এসে বলল, "অ্যাই, তাড়াতাড়ি জল আন। মজা করতে গিয়ে শেষে—"

মোহন জল আনতে ছুটল, তার ঠোঁটে বাঁকা হাসি। আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছিলাম না। বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "অমল, তুই বেঁচে আছিস? খবরের কাগজে যে—"

বিপুল মুচকি হেসে বলল, "ওটা কয়েক বছর আগের বাসি খবর। ঠোঙার কাগজে নিউজটা দেখেই প্রথমে প্ল্যানটা আমার মাথায় আসে!"

"তাহলে প্ল্যানচেট?"

"ওটা ফণ্টের ফক্কিকারি!"

আমি স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললাম, "অমল, তোর মুখের পাউডার মুছে ফেল।"

তামাক পোড়া গন্ধ

ঠিক যেন গল্পের বইয়ের পাতা থেকেই এইমাত্র ওরা লাফিয়ে নামল, রিকশা থেকে না। কোনো অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর চারটি চরিত্র, ওরা চার বন্ধু।

মাথার ওপরে তখন উত্তরবাংলার গনগনে বিকেল। তুলোট মেঘের ওপরে রঙের খেলা সেতারের তারের মতো। গমগম করছে। পায়ের কাছে পুরু ঘাসের ওপর ওদের মালপত্র টুকিটাকি ছড়ানো। খালি রিকশা-দুখানা এখনো চোখের আড়ালে চলে যেতে পারেনি, ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে যাচ্ছে যেন। চালক দুজন থেকে থেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে।

আড়মোড়া ভেঙে হাত-পায়ের সাড় ফেরাতে ফেরাতে মনোজ পিকলুকে জিজ্ঞেস করল, "এই বাড়িটাই তো? কোনো ভুল হয়নি চিনতে?"

লালু সামান্য বিরক্ত হয়ে বলল, "এই নিয়ে তিনবার হল, মনু! আরে বাবা, পিকলু তো আর আমাদের মতো প্রথম আসছে না! ওর দাদুর বাড়ি, ভুল করবে কেন?"

পিকলু বলল, "স্টেশন থেকে চোখ বেঁধে দিলেও আমি তোদের ঠিক এখানে নিয়ে আসতে পারতাম। তোর বড় সন্দেহবাতিক।"

মনোজ ওদের কথা শুনে খুশি হল না। বলল, "সন্দেহের কথা আসছে কেন। কিছু বললেই তোদের ওই! রিকশাঅলা দুটো কেমন চোরের মতো তাকাচ্ছিল দেখলি না। তাই ভাবলাম, সেই কোন্ ছেলেবেলায় এসেছিস, যদিই কোনোভাবে···নাঃ আমার ঘাট হয়েছে।"

বড় বড় গাছে ভর্তি কম্পাউণ্ডের পেছনে লালরঙের বাংলোবাড়িটা

দেখা যাচ্ছিল। নিখিল এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, "বাড়িটা কী রকম নির্জন দেখেছিস। এরকম জায়গায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে গেলে মনে হবে এক মাস থেকে গেলাম।"

ওরা কেউ কথা বলল না। খিদেয় ক্লান্তিতে কথা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কয়েক শো মাইল একটানা ট্রেন জার্নির পর বোধ হয় এই রকমই হয়। ট্রেন থেকে নামলেও ট্রেন আর মগজ থেকে নামতে চায় না, তার ঢুলুনি, তার চাকার আওয়াজ যেন লেগেই থাকে। ওদের গা টলছিল, মাথার মধ্যে একখানা পুরনো রেকর্ড ঝিকঝিক ঝমঝম করে ঘুরেই চলেছে টের পাওয়া যাচ্ছিল। না-দেখা নতুন জায়গার কী রকম একটা গন্ধ থাকে যা ওদের কিছু সময়ের জন্য আবিষ্ট করে রাখল।

এই প্রথম ওরা একা-একা এতদূরে বেড়াতে এল। মনোজের ভাষায় ফরেন-এ। তা ঠিক। উত্তর-কলকাতার ছেলে চলে এসেছে উত্তরবাংলার এক প্রান্তিক শহরে। মানচিত্র যাই বলুক, এটা ওদের কাছে বিদেশ ছাড়া আর কী! পিকলু ছাড়া বাকি তিনজনেরই দৌড় বলতে গেলে বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর আর ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত। সত্যি তাই। আসলে হায়ার সেকেণ্ডারি এমনই একটা পরীক্ষা যার পরে মানুষ রাতারাতি বড় হয়ে যায়। তাই পরীক্ষার পরে যখন সামনে তেপান্তর-মাঠের মতো ধু-ধু ছুটি তখন হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। বাড়ির সবাই রাজি হয়ে গেলেন এক বাক্যে। অনেক দিন কোনো খবর না পেয়ে পিকলুর মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই পিকলু যাচ্ছে তার দাদুকে দেখতে। দাদু মানে মায়ের এক কাকা। সিভিল সার্জেন ছিলেন, রিটায়ার করে এখন পৈতৃক বাড়িতে একা থাকেন। শিকারি হিসেবেও নামডাক ছিল এক সময়। সে-সব গল্প পিকলুর বন্ধুরা অনেক শুনেছে। তাই প্রস্তাব আসতেই ওরা সঙ্গে জুটে গেল। দিন-সাতেক কাটিয়ে এলে মন্দ হয় না।

মিনি বেডিং, ফোমের স্যুটকেস আর কাঁধের ঝোলা তুলে নিয়ে

ওরা এগোল। কাঠের ফটক খুলে ভেতরে পা দিয়েই হাওয়াবদল বুঝতে পারল। দুপুরবেলা পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে যেমন চমক লাগে। স্থির থেমে থাকা জলও কীরকম গা মিলিয়ে রকমারি ঠাণ্ডা গরম। কম্পাউণ্ডের মধ্যেও তেমনি। যেন কেমন ঠাণ্ডা ড্যাম্প ধরা এয়ার পকেটের মধ্যে ওরা এসে পড়েছে।

মনোজ পিকলুর কানে কানে বলল, "তোর দাদুর বাগানটা এয়ার-কণ্ডিশন করা নাকি র‍্যা?"

দাদুর জন্যে পিকলুর মনটা কী-রকম ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, মনোজের ঠাট্টাটা সে গায়ে মাখল না। তবে হাওয়াটা যেন স্যাঁতসেতে, বন্ধ ঘরের মধ্যে আটকে থাকা, কেমন বাসী-বাসী। সেও অনুভব করছিল। যত এগিয়ে যাচ্ছিল, শীতল গা-সিরসির ভাবটা টের পাওয়া যাচ্ছিল স্পষ্ট করে। আসলে উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলটা ভিজে জায়গা, কলকাতার মতো নয়, গড় বৃষ্টিপাত এখানে অনেক বেশি। গাছপালার দিকে তাকালেই সেটা টের পাওয়া যায়। মাটির অফুরন্ত রসে ওদের চেহারাই এখানে অন্যরকম। খরা রাজ্যের কি ডাঙার দেশের চেনা গাছপালার বদলে ভিন্ন জাতের গাছ এখানে সমাজ বেঁধেছে। গাছের গায়ে সবুজ ভেলভেটের মতো মস্, আর বহুরূপী অর্কিড। সাদা পায়রার মতো বড় বড় ফুল ম্যাগনোলিয়া। ধুতরোর ঝোপে এক-দেড় হাত লম্বা চোঙার মতো ফুল। সবই অদ্ভুত। জল হাওয়া মাটি—সব কিছু।

বারান্দায় উঠে নক করবার আগেই দরজা খুলে গেল। দাদু। হাসি-হাসি মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। বোধ হয় জানালা দিয়ে আগেই দেখতে পেয়ে গিয়েছিলেন। বাংলোর ভেতরটা গোধূলির মরা আলোয় আবছায়া হয়ে আছে। চারপাশ বন্ধ, ঘষা-কাচের জানালা দিয়ে আর কত আলো আসবে। তবু দাদুকে খুঁটিয়ে দেখতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না।

এই ক'বছরে দাদুর মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। লম্বা ছিপ-ছিপে চেহারাটাও সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকেছে। বাদবাকি সব

ঠিক আছে। মায় ঠোঁটের হাসি আর দিনরাত্তির কামড়ানো পাইপটা। নিবুক জ্বলুক লাগাতার। অষ্টপ্রহর লেগেই আছে। হালকা-সবুজ রঙ চশমার কাচের ওপিঠে দুটো ছটফটে বে-আন্দাজ চোখের তারা, বাঁ রগ থেকে কপাল তক সরু কেঁচোর মতো তিড়বিড়নো শিরাটা যেমন ছিল। পাজামা-গেঞ্জির ওপর সেই হাঁটু-ডুবোনো সাহেবি আলখাল্লা, কোমরের কাছে সিল্কের দড়ি দিয়ে বাঁধা। পায়ে চটি-মোজা। ভাঁজ করা ইংরেজি খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে দাদু উঠে এসেছিলেন। হেসে ফেলে বললেন, "ওয়েলকাম টু ইউ দাদুজ। দাদুভাইসকল, স্বাগতম্! ভেতরে এসো। আমি জানতাম তোমরা আসবে, তাই অপেক্ষা করছিলাম।"

পিকলুর গলায় অভিমান ভারী হল, "শুধু অপেক্ষা করলেই দায়িত্ব খালাস আর দোষ ফুরিয়ে যায় বুঝি! চিঠি লেখা তো ছেড়েই দিয়েছ, চিঠি দিলেও কোনো উত্তর দেওয়া হয় না কেন শুনি?"

পিকলুর দাদু ঠোঁটের কোণে যেমন হাসছিলেন তেমনিই হাসতে হাসতে বললেন, "দাদুভাইয়ের আমার মেজাজ বড্ডই খারাপ হয়ে আছে! এসো, সবাই ঘরে এসো।"

ওরা ভেতরে ঢুকে মালপত্র নিয়ে ইতস্তত করার আগেই দাদু আঙুল দিয়ে ঘরের একপাশ দেখিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ বাজ-খাঁই গলায় এমন একটা হুঙ্কার দিলেন যে মনে হল সমস্ত বাড়িটার পিলে চমকে গেল, কাচের দরজা-জানালা ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। সেই সঙ্গে ওরাও। নিখিল এমনিতেই শান্ত আর ভিতু টাইপের। ওর হাত থেকে স্যুটকেসটা পড়ে গেল। ও একেবারে অপ্রস্তুত। কাচুমাচু মুখে তাকিয়ে দেখল দাদু সেই আগের মতোই মুচকি মুচকি হাসছেন। মাথা নেড়ে নিচু গলায় বললেন, "ব্যাটা চোর, একের নম্বরের ফাঁকিবাজ, নিশ্চয় কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছে।"

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। দাদুর হুঙ্কারের লক্ষ্য তারা নয়, হতেই পারে না, এটা আগেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু কে? পিকলু তার মালপত্র নামাতে নামাতে বলল, "চাকর-বাকর কাউকে

হঠাৎ এমন হুঙ্কার দিলেন, পিলে চমকে গেল

ডাকছেন। অনেক আগে দেখেছি, একটা নেপালি বুড়ো ছিল।"

"অ্যাই ভূত! অ্যাই ভূতের বাচ্চা! শুনছিস—এই দেড়েল!"

দাদু আর-একবার গর্জন করে উঠলেন। এইবার বোঝা গেল দাদুর হুঙ্কারের তলায় একটা কৌতুকের ভাব, একটা উছলে ওঠা হাসি চাপা রয়েছে। এবং তার থেকেও স্পষ্ট করে বোঝা গেল, ওদের পাশে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক একটা দমকা হাওয়ার মতো, তার পায়ের আওয়াজ কান এড়িয়ে গেলেও নিশ্বাসের সাঁই সাঁই শব্দটা হেঁপো রুগির মতো, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

আসলে ঘরের চাপা আলো আর ছায়ার মধ্যে ওই ডোরা-কাটা পোশাক পরা লোকটা এক পলকের ধাঁধার মতো ওদের অন্যমনস্ক চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। সদরটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘরের ভেতরে আলোটা এখন আর-এক পর্দা কম, তবে কাজ চলে যায়। ওরা সবাই দেখল তালপাতার সেপাইয়ের মতো লোকটা হাত জোড় করে সামনের দিকে এক হাত ঝুঁকে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একমুখ দাড়ি আর পাগড়িসুদ্ধু মাথাটা এমন ভাবে গর্দান বাড়িয়ে নুইয়ে রেখেছে যে মনে হয় যে-কোনো হুকুম এবং দণ্ড শিরোধার্য করতে ও প্রস্তুত। অবিশ্যি হুকুম পেলেই যে ওই অত্তোবড় মাথাটা ওই লগবগে ঘাড়ের ওপর আর খাড়া হতে পারবে সেটা সন্দেহজনক।

এই বিনয়ের অবতারটিকে সামনে পেয়ে গিয়ে দাদুর রাগ জল হয়ে গেল। পিকলুদের স্নান খাওয়া বিশ্রামের বন্দোবস্ত করতে বলে বললেন, "এরা আমার নিজের লোক মনে রাখবে। কোনো রকম চালাকির চেষ্টা যেন না হয়। যাও, মালপত্রগুলো ওদের ঘরে তুলে দাও।"

লোকটা কোনো কথা বলল না। শুধু জবাবে আরও আধ হাত মাথা নুইয়ে চলে গেল। সেকেণ্ড তিন-চার পরে ওরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লোকটা নেই, সেই সঙ্গে ওদের মালপত্রগুলোও ভ্যানিশ হয়েছে।

পিকলু অবাক হয়ে বলল, "এই চিজটিকে আবার তুমি কোত্থেকে যোগাড় করলে, দাদু? তোমার সেই আগের বুড়োটাকে তো

দেখছি না।"

দাদু মুখভঙ্গি করে বললেন, "আর বলিস না, সেটার কী যে হল, পালাল। সে যাবার পরেই এটা এসে জুটেছে। আমার নতুন রিক্রুট বলতে পারিস। বরাবরের অভ্যেস একা থাকতে পারি না, কী আর করি। আর এই আফিমখোর ব্যাটাও দিনরাত্তির বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করছিল দেখে বললাম, থাক হতভাগা, থেকে যা। তুইও একা আমিও একা। কিন্তু বুঝলে পিকলুইভাই, লোকটার স্বভাব-চরিত্তির ভাল না। কেন ভাল না? একটু হাতটান আছে! সুযোগ পেলেই সরায়।"

দাদুর বলার ভঙ্গিতে পিকলু হেসে ফেলল; বলল, "বুঝেছি, লোকটা একটু চোট্টা আছে। সুযোগ পেলেই তোমার পয়সাকড়ি খাবার-দাবার হাপিস করে দেয়। ওর ও-রকম হ্যাংলা চেহারা দেখেই আমরা বুঝেছি।"

"না না, সে সব না। সে সব কিছু না। লোকটা আসলে সময় চুরি করতে ওস্তাদ, সুযোগ পেলেই খানিকটা সময় বেমালুম হাতিয়ে নেবে। তা নিক, আমার তো অঢেল সময়, খরচ করার লোক নেই। তবে ঐ যে বলছিলাম আজব, চোখের পলকে কাজ করে, চোখের পলকে ঘুমোয়। এক সঙ্গে কুঁড়ে আর চটপটে হয় বলে কখনো শুনেছ?"

"তা হোক, অচেনা একটা লোককে এভাবে এক কথায় বাড়িতে জায়গা দেওয়া ঠিক হয়নি। শেষে কোন্ দিন টাকা-পয়সার লোভে তোমাকে খুন করে পালাবে। তোমার বয়স হয়েছে, একা থাকো। নাঃ, কাজটা বোধ হয় ভাল করনি।"

লালু বলল, "হ্যাঁ, আজকাল তো ও-রকম ঘটনা আকচার ঘটছেই। কাগজে প্রায়ই থাকে।"

"খুন! আমাকে খুন করবে ওই বুদ্ধু ভূতটা?" দাদু হাঃ হাঃ করে হাসলেন মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে, "ওটা একটা পাকা ইডিয়েট। সেই কবিতার কেষ্টার মতো, পড়োনি? ভূতের মতন চেহারা যেমন

নির্বোধ অতি ঘোর। ওটা তাই। আচ্ছা ভাইসব, তোমরা জিরিয়ে নাও, পরে গপ্পোসপ্পো হবে, আমি এখন একটু ঘুরে আসি। যা দরকার হুকুম করে চেয়ে নেবে, কেমন?"

দরজার পাশ থেকে ছড়িটা তুলে নিয়ে বগলে খবরের কাগজ আর মুখে পাইপ গুঁজে দাদু বেরিয়ে গেলেন। লালু আর পিকলুও দাঁড়াল না, স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নেবার জন্যে ওরা ভেতরে চলে গেল। বাইরে হলঘরে তখন শুধু মনোজ আর নিখিল। অবেলায় নতুন জায়গার জল নিখিলের সহ্য হয় না, সে একটু সুখী টাইপের। সোফার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

মনোজ কটাক্ষ করে বলল, "তোর শুধু ওই, সুযোগ পেলেই বডি ফেলে দিস। ওর সঙ্গে জমবে ভাল। যাই দেখে আসি গে, উনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন কি না।"

নিখিল বুঝল মনোজের মতলবটা কী! ওর মতো পেট-কাতুরে খুব কমই আছে। একেবারে জলজ্যান্ত খাই-খাই একটা। হেসে ফেলে বলল, "হ্যাঁ যাও, তোমারও শুধু ওই।"

"আমি একার জন্যে যাচ্ছি না।" মনোজ বলে হাসল।

একা হতেই নিখিল প্রথম তামাকের গন্ধটা পেল। কেউ যেন তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে। অথচ দাদু যতক্ষণ পাইপ মুখে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিখিল গন্ধটা পায়নি। কেমন গা-ছমছম করছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বসল। রাগ হল মনোজের ওপর। খিদে সকলেরই পেয়েছে, তা বলে তোর মতো কেউ ছটফট করে বেড়াচ্ছে না।

এমন সময় মনোজ ফিরে এল। চোখ-মুখের চেহারা কেমন উদভ্রান্ত। নিখিলের পাশে ধপ করে বসে পড়ে বলল, "যাঃ বাবা। এটা বাংলোবাড়ি না গোলকধাঁধা?"

"কেন, কি হল?"

"বাপস্! কটা ঘর রে এ-বাড়িতে?"

"কত আর। তিন-চার খানা হবে। কেন বল তো?"

বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে মনোজ বলে, "তাই তো হওয়ার কথা, আমি তো সেই রকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু কিচেন খুঁজতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললাম। যত এগোই দেখি দরজা আর ঘর, দরজা আর ঘর। ঘরেরও শেষ নেই দরজারও না। এক দরজা দিয়ে ঢুকে আর-এক দরজা দিয়ে বেরোনো। বড় বড় আয়নাগুলোয় এই দরজাগুলোর ছায়া পড়ে আরও গোলমেলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময় টের পেলাম ঘুরে ঘুরে আমি শুধু একটা ঘরের মধ্যেই প্রতিবার এসে দাঁড়াচ্ছি। মাথাটা কী-রকম ঘুরে যেতেই ফিরে এলাম। অথচ লোকটা খুব কাছেই কোথাও ছিল। থেকে-থেকে আমি ডিমভাজার ইন্টিমেট গন্ধটা পাচ্ছিলাম।"

নিখিল বলল, "আমি জানতাম এ-রকম হবে।"

"কী হবে?"

"তোর মাথার গোলমাল।"

"কেন?" সন্দেহের বশে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মনোজ জিজ্ঞেস করে।

"দু দিন চান করিসনি। তার ওপর এত মাইল ট্রেন জার্নি। তার ওপর খিদের মুখে ডিমভাজার গন্ধ। এতে ভালমানুষ কোন-না পাগল হয়ে যাবে, তা তুই। তোর তো একটু আছেই! নেই?"

মনোজ উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই মুখ খুলেও থেমে গেল। সেই পাগড়িসর্বস্ব দেড়েল লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে প্রকাণ্ড ট্রে, তাতে ওমলেট, কাজু আর কফি। চারজনের জন্যেই এসেছে। বর্তমান অবস্থায় লোভনীয়। লোকটা চোখ তুলে বোধ হয় আর দু'জনকে খুঁজল।

মনোজের তর সইছিল না। বলল, "রেখে যাও। ওরা চান করতে গেছে, এই এল বলে।"

লোকটা সেণ্টার টেবিলের ওপরে কাপ আর প্লেটগুলো নিঃশব্দে নামাল। তারপর খালি ট্রে-টা নিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেল। যেমন এসেছিল তেমনি। যেন সুতোয় ঝোলানো তালপাতার

সেপাই। পায়ে কোন শব্দ নেই। মহাজাতি সদনে একবার পুতুল নাচ দেখেছিল, মনে পড়ল নিখিলের।

"লোকটা কী বলতে বলতে গেল রে?" মনোজ শুধোল।

"ভাল শুনতে পেলাম না। অসন্তুষ্ট হয়েছে বোঝাই যায়। এক টুকরো কথা শুধু কানে এল। ভূতের ব্যাগার খেটে খেটে —না কী যেন বলছিল। নিশ্চয় পিকলুর দাদুকে মিন্ করে—"

"তা ভাই, সব সময় ও-রকম সম্বোধন শুনলে কে আর খুশি হয়? চান-টান বুঝলি পরে হবে'খন।" মনোজ আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তার ডিশের ওপর ঝুঁকে পড়ল। নিখিল জবাবে কী যেন বলল, সেকথা আর ওর কানে ঢুকল না।

দেওয়ালে একটা বারশিঙা হরিণের মুণ্ড দেওয়ালগিরির আলোয় মায়াময় দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল শিঙের ডালপালার মধ্যে বনের জ্যোৎস্না আটকে আছে। জ্বল-জ্বলে চোখে প্রাণীটা যেন থমকে দাঁড়িয়ে বাতাসের ঘ্রাণ নিচ্ছে। শুকনো ডাল কারো অসাবধান হাতে নীচে পড়ে কচি ছেলের আঙুল মটকানোর মতো শব্দ হয়েছে বোধ হয় এক বিন্দু। অরণ্যের গোপন সংকেত। নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় উৎকর্ণ হয়ে থেমে আছে বারশিঙা।

সকলকে চমকে দিয়ে নিখিলই প্রথম কথা বলল, "ভূত কি সত্যিই আছে?"

ঘরজোড়া ঢালাও বিছানায় শুয়ে রাতের খাবারের ডাকের জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। কেউ ঘুমোয়নি। সারা দিনের ক্লান্তিতে কেমন একটা নিঝুম ভাব এসেছিল শরীরে। তাই কেউ কথা বলছিল না। আধবোজা চোখ থেকে-থেকে তন্দ্রার বুড়ি ছুঁয়ে ফিরে আসছিল ছেঁড়াখোড়া চিন্তার জালের মধ্যে।

লালু কয়েক সেকেণ্ড পরে উত্তর দিল, "এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যখন মহাশূন্যের পরদা সরিয়ে গ্রহে গ্রহে উঁকি মেরে বেড়াচ্ছে তখন এই ধরনের কুসংস্কার ভাবাই যায় না। এটা আমাদের দেশেই সম্ভব

যেখানে বাটি চালান আর জেট প্লেন চালান সমান তালে চলেছে। আরে বাবা, তাবিজ কবচ আর ভূত প্রেতের দিন পঞ্চাশ বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে।"

মনোজ দুর্বল গলায় প্রতিবাদ করল, "তা হলে কি তুই বলতে চাস প্ল্যানচেট ব্যাপারটাও বুজরুকি? আত্মার ব্যাপারটা বাজে কথা?"

পিকলু বলল, "আমি এমন সব আলৌকিক গল্প শুনেছি যা অবিশ্বাস করা শক্ত। যাঁদের মুখে শুনেছি তাঁরা মিথ্যে কথা বলার লোক না।"

লালু জোর গলায় বলল, "ও সব গপ্পো! মন যখন দুর্বল হয় তখন জলপড়া তেলপড়াতেও বিশ্বাস হয়। আমি প্রুফ চাই। কেউ প্রমাণ দিতে পেরেছে আজ পর্যন্ত?"

নিখিল আবার সবাইকে চমকে দিয়ে বলল, "ভূত আছে। আমি তার গন্ধ পেয়েছি। এখনো পাচ্ছি।"

লালু ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল, "তাই বল, নিখিল আমাদের ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছে। ভূতের গায়ে কী-রকম গন্ধ, অ নিখিল?"

নিখিল কিছু বলার আগেই হঠাৎ দপ করে ঘরের আলো নিবে গেল।

যেন আলো নয়, তাদের তর্কটাই উত্তেজনার চূড়ায় উঠতে গিয়ে পা হড়কাল। দেওয়ালে তেলের বাতি দিব্যি জ্বলছিল। একটা দমকা হাওয়া না, তেল ফুরোনোর ওয়ার্নিং না; ঠিক বিজলী বাতি চলে যাওয়ার মতো চোখের পলকে আলো গেল। শুধু এই ঘর নয়, সমস্ত বাড়িটাই বুঝি ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ডুবে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে নাকে সেই গন্ধটা, সেই সুঘ্রাণ তামাক পোড়ার গন্ধ, যেন এক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে কেউ পাইপ টানছে। আর এবার কেবল নিখিল নয়, চার-বন্ধুই এক সঙ্গে চমকে উঠল। আর ওদের মনের সেই চমক ছুঁয়েই কেউ ঘরের মধ্যে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। কেউ নয়, দাদু! এ-গলা সকলেরই চেনা।

"গন্ধটা এই রকম, তাই না, অ নিখিল?" দাদু নাটুকে গলায়

লালুর মুহূর্ত আগের কথাটা নকল করে যেন ফিরিয়ে দিলেন।

পিকলু চেঁচিয়ে উঠল, "ভারী অন্যায়! তুমি কিন্তু আমাদের ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে দাদু!"

"কিসের ভয়।"

"ভূতের!" মনোজ বলল, "কখন ফিরলেন?"

"এই তো।" দরজার ফ্রেমের মধ্যে, দাদুর চেহারাটা একটা অন্ধকার আউটলাইনে ফুটে উঠল। আসলে চোখ সয়ে গেলে চারপাশের অন্ধকার যেমন কিছুটা জ্যালজেলে হয়ে যায়, খোলা দরজার কাছটা এখন সেই রকম। "তোমাদের গৃহযুদ্ধের কোলাহল শুনে দেখতে এলাম। তা আলোটা নেবাল কে?"

ওরা সবাই বিছানার ওপর উঠে বসেছিল।

লালু যেন মনোজ আর নিখিলকে খোঁচা মেরে কথাটা বলল, "ভূতে।"

মেঝেতে বারকয়েক ঠুকঠুক শব্দ হল। ছড়ি ঠুকে-ঠুকে বিছানা আন্দাজ করে দাদু এগিয়ে এলেন। মনে হল ওদের থেকে খানিকটা তফাতে বিছানার ওপর বসেও পড়লেন।

"কিন্তু তুমি তো ভূতে বিশ্বাস কর না!"

"না, করি না।" লালু কিঞ্চিৎ গর্বের সঙ্গেই জবাব দিল, "যা চোখে দেখা যায় না, আমার কাছে তার অস্তিত্বই নেই।"

লালুর কথা শুনে দাদু হেসে উঠলেন শব্দ করে, "আমাকেও তো এখন দেখতে পাচ্ছ না, তাহলে?"

এরকম একটা যুক্তি দেখানো হবে লালু যেন জানত, তাই বিছানার পাশ থেকে টর্চলাইটটা নিয়ে সে তৈরি হয়েই ছিল। আলো জ্বেলেই সে বলে উঠল, "কেন, এই তো আপনি—"

লালুর শেষ কথাটা টর্চের উজ্জ্বল আলোয় একটা আর্তনাদের মতো মোচড় খেয়ে থেমে গেল। বিছানার এক পাশে দাদুর ছড়ি আর ভাঁজকরা খবরের কাগজখানা শুধু পড়ে রয়েছে। দাদু নেই।

চোখ

এক একদিন এরকম হয়। ওরা চলে যাবার পরও আড্ডা থামে না। আড্ডা তখন আমার মগজে পুরনো ফাটা 'রেকর্ডের' মন বাজতে থাকে। মেসের এক চিলতে ঘরে দড়ির খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে বেড সুইচ নিবিয়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকি। আমার কানের মধ্যে ভূপতি আর নলিনাক্ষর আবেগমাখা অফুরন্ত কথা আর তর্কবিতর্ক, যুক্তি আর পালটা যুক্তি ধারাবাহিক বাজতে থাকে। বিষয় থেকে বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা এক অসংলগ্ন নাবিকের মত। বা কখনো কোনো একটি ঝলসে ওঠা সংলাপ পিনবসে যাওয়া ফাটা রেকর্ডের মত একটি দুটি শব্দের আখরে মুহুর্মুহু বাজতে থাকে। তারপর এক সময় ঠাকুর এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় খাঁকারি দিয়ে ডাকে, বাবু খেতে আসেন!

ভূপতি ডাক্তার। হাসপাতালের সার্জন। প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করে না বলে তার হাতে সময় আর মাথার খেয়ালের অন্ত নেই। কী একটা দুরূহ বিষয় নিয়ে ও অনেক দিন থেকে নিঃশব্দে গবেষণা করে চলেছে। আর নলিনাক্ষ কোনো কলেজের বটানির প্রফেসার। ওঁর লেখা টেক্সটবুক বাংলা ভাষায় একমাত্র বই যাকে অনেকেই সশ্রদ্ধ ঠাট্টায় বটানির বাইবেল বলে। একটা বইই ওকে বড় লোক করে দিয়েছে। ওদের দুজনের মাঝখানে আমি হাইফেনের মত এখনো বন্ধুত্বে অচ্ছেদ্য হয়ে আছি। কমনফ্রেণ্ড যাকে বলে। আমি নিজেও সত্যিই কমন। বিয়ে-থা করিনি, চালচুলো নেই, মেসে থাকি। চাকরিটাও সাদামাটা। খবরের কাগজে। রংফলিয়ে বলা যায় সাংবাদিক, আসলে খবরের কেরাণী। টেলিপ্রিণ্টারের নিউজপ্রিণ্ট বাংলায় তর্জমা করি, সাজাই, হেডিং তৈরি করি, ব্যস এই পর্যন্ত।

আর আড্ডায়ও আমার ভূমিকা গৌণ, ওদের তর্কাতর্কিকে উসকে দিয়ে দিয়ে জিইয়ে রাখা, চাঙ্গা করা।

আর ওরা আসে বলেই আমার যে শুধু সময় কাটে তাই না, আমি লাভবানও হই। অনেক নতুন কথা শুনতে পাই, জ্ঞানের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, আবিষ্কারের কথা। ওরা দুজনেই বইয়ের পোকা, আর আমি বইকুণ্ঠ, কলেজ-ইউনিভার্সিটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বইও ছেড়েছি। এখন খবরের কাগজ ছাড়া ছাপা অক্ষরের সত্যি আমার কদাচিৎই সাক্ষাৎ হয়। তাই আমার রস আর রসদ আসে আমার ওই দুটি বন্ধুর কাছ থেকে। নলিনাক্ষর কাছ থেকেই আমি অনেক বিচিত্র আর বিলীয়মান গাছের কথা শুনেছি। অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছের বটানিক্যাল নাম পর্যন্ত আমার কণ্ঠস্থ হয়েছে। আজ সবাই জানে গাছের প্রাণ আছে একথা আবিষ্কার করেছিলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। কিছু গাছেরও যে মন আছে; স্মৃতি আছে, রুচি অরুচি আছে, তারাও যে মানুষের মত কথা বলে, এমন কি মানুষের সঙ্গেও, ভয়ে ক্রোধে ভালোবাসায় উত্তেজিত হয়, হার্টফেল করে মারা যেতে পারে সে কথা নলিনাক্ষ না থাকলে আমি জানতেই পারতাম না।

আজকে ছিল ভূপতির দিন। আলোচনাটা শুরু হয়েছিল রাজনীতি নিয়ে, হাসপাতালের অচল অবস্থা নিয়ে। তারপর জ্যোতিষী, প্ল্যানচেট, জন্মান্তর ইত্যাদি বিষয়ে দুই বন্ধুর মল্লযুদ্ধ হতে হতে অ্যানাটিমি-ফিজিওলজিতে এসে ঠেকল!

প্রথমে বেশ হালকা ভঙ্গিতেই শারীরিক অসঙ্গতি নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল। প্রায় সেটা আরম্ভ হয়েছিল নলিনাক্ষর তরফ থেকেই। ও বলছিল, এরকম দেখেছি, এক একজন মানুষের চেহারা আর চরিত্রের সঙ্গে তার কোন বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিল হয়নি। নিখুঁত মূর্তি গড়তে গড়তে ভগবান মাঝে মাঝে কেন এমন করেন জানি না। কারো হাত মনে হয় তার নিজের নয়, শরীরের ছাদের সঙ্গে একদম মানায়নি, কিংবা হাতের সঙ্গে আঙুলগুলো, বেমানান দেখলেই মনে হয় হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—দু ছড়া কলার মত। মাথা যেন মাথা নয়—

ঘাড়ে চেপে বসেছে উটকো ভাড়াটের মত। এইভাবে কারো নাক, কারো কান, কারো পা। একজন ঢিলে-ঢালা অসল স্বভাবের মানুষ, দেখলেই বোঝা যায় আঠারো মাসে বছর কিন্তু হাঁটে যখন মনে হয় টাট্টু ঘোড়া ছুট লাগিয়েছে।

আমি বলছিলাম, হ্যাঁ, এই অমিলগুলো হাসির কারণও হয়ে ওঠে কখনো কখনো। হয়তো আড়াইমন ওজনের পিপের মত মোটা লোকটা পেন্সিলের সিসের মত সরু গলায় কথা বলে ওঠে। আবার প্যাঁকাটি মার্কা নির্জীব চেহারার মানুষের গলায় মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে গিয়ে তখন তোমার রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইনটাই মনে পড়বে: অ্যাতোটুকু যন্ত্র হতে এতো শব্দ হয়, সত্যি বিষম বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে!

নলিনাক্ষ হাসল, হ্যাঁ, এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই একটা অদৃশ্য হার্মনি আছে। ছোট ঘড়ি বড় ঘড়ি সব এক মাত্রায় চলেছে। নিক্তি মাপা রাস্তায়। কিন্তু কখনো কখনো কিছু ব্যাপার খাপছাড়ার মত ঘটে। কেমন যেন শ্রিংকোনাইজ করে না। ঘড়ির কাঁটা এক কথা বলছে কিন্তু তার বাজনা অন্য কথা। ঘড়িতে আটটা বেজেছে হয়তো কিন্তু ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল, দেখোনি কখনো? মানুষের চোখে আর ঠোঁটেও এমনি ঘটনা ঘটবে দেখেছি। ঠোঁটের সঙ্গে চোখ মিলছে না, কিংবা চোখের সঙ্গে ঠোঁট। হয়তো হাসির কথা বলছে। ঠোঁট-মুখ হাসিতে ফেটে পড়ছে কিন্তু চোখ হাসছে না, কেমন বিষণ্ণ কিংবা ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। খুব নিবিষ্ট হয়ে কোন সমস্যার কথা ভাবছে লোকটা কিন্তু তার চোখ দুটো খঞ্জনি পাখির মত নেচেই চলেছে অনবরত। কিংবা হাসছে রহস্যময় হাসি।

ভূপতি লুফে নিল কথাটা, 'ইয়েস নলিন, তুমি একটা জব্বর প্রশ্ন তুলেছ কিন্তু তার আগে বলি, চোখ আমাদের একটা ভাইটাল অর্গান। প্রতিমায় দেখোনি চক্ষু দান করা হয় সকলের শেষে, চক্ষু যোজনা মানেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা। জড় পদার্থ দেখতে পায় না, কেননা তাদের প্রাণ নেই। তোমার সাবজেক্টেই আসি, গাছ দেখতে পায়,

তার চোখ আছে, সে যে প্রাণী এইটেই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। চোখ আমাদের অর্ধেক মগজ, বলতে গেলে আমাদের বারো আনা মনই বাঁধা আছে তার মধ্যে। জীবনের একটা প্রধান ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ এবং বর্জন। চোখের ভেতর দিয়ে সেই কাজটাই আমরা প্রতিমুহূর্তে করে যাচ্ছি। চোখ তাই কেবল শরীরের সৌন্দর্য বর্ধন করে না, সে আমাদের চেতনা বা প্রাণকে সজাগ রাখে।

আমি হেসে উঠলাম শব্দ করে। আমার হাসি মানেই উসকানি। বললাম, 'তোমার কথাগুলো আমি ঠিক গিলতে পারছি না, বেজায় গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে, ভূপতি। তোমরা বিজ্ঞানীরা আমি দেখেছি সহজ ব্যাপারটাকে কেমন জটিল করে তুলে আনন্দ পাও। চোখ জিনিসটা তো শুধু দেখবার জন্যে, যেমন চশমা। তার মধ্যে ফালতু এতসব ব্যাপার ঢুকিয়ে দিচ্ছ কেন?'

ভূপতি রেগে গেল। বলল, 'তোমার মুণ্ডু! সত্যি, মাথায় যদি তোমার শুধু গোবর পোড়া থাকত তাহলেও আশা ছিল। গোবর থেকে গ্যাস হয়, তা থেকে জ্বালানি, আলো, বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাদের খুলির মধ্যে শুধু রীম রীম নিউজ প্রিণ্ট ঠাসা তারা হোপলেস! চোখ দুটো দিয়ে কি আমরা শুধু দেখিরে হতভাগা! চোখ দিয়ে আমরা যেকোনো জিনিসকে ছুঁতে পারি, আস্বাদন করতে পারি। আমাদের শাস্ত্রে আছে ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয়। কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। চোখ দিয়েও আমরা খেতে পারি, শুনতে পারি, কথা কইতে পারি। ভিস্যুয়্যাল মেমরি বলে একটা কথা শোনা আছে নিশ্চয়। তা চোখের সত্যিই স্মরণ ক্ষমতা আছে, স্মৃতি আছে। একবারে তার নিজস্ব, মস্তিস্ক নিরপেক্ষ স্বাধীন ব্যাপার। বুঝলে ব্রাদার, এ-রকমটা নির্ভুল কমিউনিকেটিভ কম্পিউটার তুমি সারা দেহ তল্লাসী করলেও পাবে না। এই ব্যাপারটা নিয়েই আমি বহুকাল থেকে গবেষণা করে চলেছি। হয়তো একদিন প্রমাণ করে দিতে পারব।'

জানতাম। ভূপতির গবেষণার ব্যাপারটা আমার যে একেবারে

অজানা ছিল তা নয়। নিউক্লিয়ার জিনস নিয়ে ও কি সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল তাও জানি। আমাদের শরীরের সবচেয়ে ছোট ইউনিট সেল বা কোষের যে নিজস্ব এতটা জীবন আছে প্রাণ আছে, আলাদা করে বেঁচে থাকা আছে এরকম একটা কথা ভূপতিই আমাকে একদিন বলেছিল। এই ইনার ইউনিভার্স এই অন্তর্বিশ্ব যার রহস্যের দরজায় ও ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ নিয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে। কিন্তু চোখ, যা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে, কোনো সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের দরকার হয় না, তা নিয়ে যে এতখানি মাথা ঘামিয়েছে সেইটেই জানতাম না।

আজকেও ওরা চলে যাবার পর আলো নিবিয়ে খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে আমি একটা ঘোরের মধ্যে পড়েছিলাম। না ঘুমোইনি, নিশ্চয়ই ঘুমোইনি। এই উত্তেজক আলোচনার সঙ্গে নিজের চিন্তা-ভাবনা মিশিয়ে কিছু ভাববার চেষ্টা করছিলাম। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, আমার চিন্তা সেই পথ ধরেও এগোচ্ছিল না। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন এক রহস্যের জট পাকানো সূতোর তাল দিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম মাত্র। জন্মান্তর, এই জীবনের বাইরের জীবন, মানুষের ইচ্ছাশক্তি, জিনের স্রোত বেয়ে আসা মানুষের সংস্কার, অভ্যেস এবং সব শেষে এই অলৌকিক ক্যামেরা চোখ—যার ভেতর দিয়ে এক জনের মন আর এক জনের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়, সম্মোহনের এই চাবি কাঠি, এই এক ধরণের রিমোট কনট্রোল নিয়ে কল্পনার জাল বুনে চলেছিলাম এমন সময় আমার নাম ধরে কেউ ডাকল! ডাকল খুব কাছে থেকে, অদ্ভুত গলায়, আমার এক চিলতে ঘরের ঠিক দরজায় এসে।

এক ঝটকায় যেন গোটা মাকড়সার জালটা ছিঁড়ে আমার হাতে মুখে জড়িয়ে গেল, কে! আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। প্যাসেজের জিরো ওয়াটের কমজোরি আলোয় দেখলাম চৌকাঠে হাত রেখে এক সিলুয়েট মূর্তি।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?'

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি ?

'কই না।'

হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলাম। বার কয়েক চোখ পিট পিট করে টিউব লাইটটা জ্বলে উঠল। আলোয় চিনলাম। আমাদের মেসের নতুন বোর্ডার। সুশ্রী, ছিপছিপে, নায়ক-নায়ক চেহারা। একবার তাকালে ঝট করে চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না। বয়স গোটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে। দিন পাঁচেক হল এখানে এসে উঠেছেন, কিন্তু আলাপ হয়নি। এমনিতেই আমি একটু অমিশুক তার ওপর গোটা সপ্তাহটাই নাইট ডিউটিতে গেছে। নিশাচর প্রাণীর মত দিনে ঘুমোনো আর সন্ধ্যে হলেই কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। তবু আসতে যেতে দু'-এক ঝলক দেখেছি দূর থেকে।

একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আসুন আসুন।'

'স্যরি, ডিসটার্ব করলাম নাকি।'

'না না সে কি!'

'দীপক ব্যানার্জী, পাবনা থেকে এসেছি।' চেয়ারে বসে পড়ে সহাস্যে নমস্কার জানালো।

'আমি ধ্যানেশ সেন, খবরের কাগজে আছি।'

'জানি। মানে শুনেছি। আমি তো আপনার পাশের ঘরেই আছি।'

আমি জানতাম না, কারণ পাশের ঘরে অন্য একজন ছিলেন। তিনি বোধহয় ঘর বদলে নিয়েছেন। এটা সেটা দুচার কথায় আলাপ জমে উঠল। দীপকের বাড়ি পাটনায়। অবস্থা বেশ ভাল। চাকরিটা শখের। এক ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ, বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছে।

ইতস্তত করে এক সময় বলল, 'আপনার বন্ধুটি কি চোখের ডাক্তার?'

প্রসঙ্গটা ধরতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আর তখনই সত্যি করে চমকালাম। এতক্ষণ মনের যে অস্বস্তিকর কারণটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না এবার স্পষ্ট করে চোখে

পড়ল। সেই চোখ। দীপকের চোখ দুটো কেমন সবুজ লুমিনাস পেন্টের মত, থেকে থেকে আলো পড়ে জ্বলে উঠছে। কিছু কিছু পশু চোখ এরকম জ্বলে কিন্তু সেটা তেমন কোন ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার বোধহয় অন্য! ওর চোখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে মনে হল আর দশজনের যেমন হয় তেমন না। এ চোখ যেন ওর সমস্ত অস্তিত্বের বাইরে আলাদা এক ব্যক্তিত্ব। যেন আলাদা একটা মানুষ ওই চোখের ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শিরদাঁড়ার ভেতরটায় কেমন শিরশির করে উঠল। বুদ্ধি কিংবা কথা দিয়ে ও ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা অশরীরী অস্তিত্বের গন্ধ পাচ্ছিলাম যেন।

আমার মুখের চেহারা নিশ্চয় পাল্টে গিয়েছিল। ভয়-পাওয়া লোকের মত হয়তো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

চাপা গলায় দীপক বলল, 'আমার চোখের দিকে কী দেখছেন অমন করে?'

ধরা পড়ে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরালাম, 'কই না। ভাবছিলাম আপনি আমার কোন বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করছেন।'

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে দীপক বলল, 'ক্ষমা করবেন, এটাকে আড়ি পাতা ভাববেন না। আপনাদের আড্ডার সব কথাই আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম পাশের ঘর থেকে। ভেরী ইন্টারেস্টিং সাবজেকট, অন্তত আমার কাছে। আপনার যে বন্ধুটি চোখের কথা বলছিলেন, উনি নিশ্চয়ই আই স্পেশালিস্ট?'

'ও তাই বলুন। না। চোখের ডাক্তার না। তবে—'

'তবে?'

'চোখের ব্যাপার নিয়ে ওর একটা কেমন ক্ষ্যাপামি আছে। চক্ষু বিষয়ে কি একটা গবেষণা করছে বলল।'

'শুনলাম। তবে আই মাস্ট সে ক্ষ্যাপামি নয়। আমি এ ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ, আনাড়ি। তবু বলব, ওঁর অ্যানালিসিস আমাকে চমকে দিয়েছে, চোখ ফুটিয়েছে—'

আমি কথা বলছিলাম কিন্তু আমার চোখ দুটোকে যেন কোন

জোরালো চুম্বক টানছিল। চুরি করে এক আধ পলকের জন্য আমি দীপকের চোখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আর একবার চমকে দিয়ে দীপক শব্দ করে হেসে উঠল। বিস্মিত গলায় বললাম, 'হাসছেন ?'

দীপক মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। এ হাসি অনেক দুঃখের, ধ্যানেশবাবু।'

'বুঝলাম না।'

'ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, একটা প্রশ্ন করব।'

'কি প্রশ্ন ?' অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'আপনি আমার চোখ দেখছিলেন! দেখছিলেন না ?'

একটি সময় নিয়ে শেষে শুকনো গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।'

'দেখে কি মনে হচ্ছে ? এ আমার নিজের চোখ নয়, তাই না ?'

উত্তর দিতে পারলাম না। বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে গেল। লোকটা কি মনের কথা সব টের পায়! বিব্রত হয়ে চুপ করে থাকলাম।

'ঠিকই ধরেছেন। এ চোখ আমার নিজের নয়।'

আমি হতভম্ব। দীপক আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবছি কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হলনা, ও নিজেই আবার কথা বলল।

'বিলীভ মি। এ চোখ আমার সত্যিই নিজের নয়। আর সেটা বুঝতে পারলাম প্রথম কলকাতায় এসে। তা দিন দশেক আগে, তখনো মেসে এসে উঠিনি। এখানে এসে প্রথমে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠেছিলাম। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে এই মেসে। একটা বিবর্ণ হাসি দীপকের ঠোঁটে ভেসে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, 'কিন্তু আমি মূর্খ, নিজের কাছ থেকে কি কেউ পালাতে পারে!'

ভদ্রতাবশত আমি বাধা দিলাম, 'কী বলছেন আপনি! আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। তবে সে এক লং স্টোরি। আপনাকে বোর করছি না তো ?'

দীপককে দেখে, তার কথা শুনে আমার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল এই চোখের পিছনে কি রহস্য লুকোনো আছে কে জানে।

বললাম, 'ঠিক উল্টো। বলুন আপনি। গপ্পো শুনতে কার না ভাল লাগে!'

'এটা কিন্তু গপ্পো নয়। ফ্যাকট, সত্যি ঘটনা। ব্যাকরণ ভুল হল নিশ্চয়ই, ট্রু ফ্যাকটের মত। তবে আপনার ভাবনার কোন কারণ নেই, যতদূর সংক্ষেপে বলা যায় তাই বলব।'

দীপকের কথাগুলোকে ছাঁটকাট করে সাজালে তার মুখের গল্পটা এইরকম দাঁড়ায়ঃ

সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলে এই পৃথিবী, এই চারপাশ, এই জীবন কেমন লাগে আমার জানা আছে। কারণ একটানা পাঁচ বছর আমি কমপ্লিট ব্লাইণ্ড হয়ে ঘরে বসেছিলাম। আমার দুনিয়া তখন দুহাতের গণ্ডির মধ্যে, হাতড়ে বেড়ানো ছোট্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ি তখন শুধু কানে শোনা একটা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। প্রহরে প্রহরে ভাগ করা, দিন আর রাত একাকার হয়ে গিয়ে অনিঃশেষ একটি ভয়ঙ্কর রাত্তির হয়ে গিয়েছিল, যে রাত্রে চাঁদ নেই, তারা নেই, নিরেট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। আমার জীবন অর্থহীন আমার আহার বিস্বাদ, আমার প্রিয় বইগুলো বোবা। সম্পূর্ণ একলা মানুষের চেয়েও আমি নিঃসঙ্গ, একা। শব্দ এবং নৈঃশব্দের মাঝখানে বন্দী প্রেতের মত ভেসে রয়েছে। এই যন্ত্রণার তুলনা হয় না।

অথচ দুর্ঘটনা যখন ঘটে এরকমই অকারণে এক পলকে ঘটে যায়। ঘটনার পিছনে যুক্তি থাকে, কিছু দুর্ঘটনার কোনো যুক্তি নেই। অর্থাৎ সেটা না ঘটতেই পারত তবু ঘটল। আমার তিরিশ বছরের জীবনে বছর বছর হোলির দিন এসেছে, চলে গেছে। সাবান মেখে সে আবির আর রঙ তুলে ফেলেছে। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর আগের দোলের দিনটি বোধহয় আলকাতরার মত কালো রঙ নিয়ে এসেছিল। সেদিন ফাগুয়ার তাণ্ডবের মধ্যে কেউ আমার চোখে রং ছুঁড়েছিল। কি ছিল সেই রঙের মধ্যে জানি না, অনেক কষ্টে যখন চোখ খুললাম তখন দুটো

চোখেই আর দৃষ্টি বেবাক অন্ধ হয়ে গেছি। চোখের সামনে যেন কোনো মানুষ নেই, দৃশ্য নেই, কিচ্ছু নেই। তবু তখনো একটু আলো ছিল, ঠিক আলো নয়, আলোর আভার মত। ঠিক কি রকম জানেন, গভীর জলের তলায় ডুব দিয়ে চোখ খুললে যেমন দেখা যায় অনেকটা সেই রকম। ডাক্তার বদ্যি এলেন কিন্তু তাঁরা বিদায় নেবার আগেই সে আভাটুকুও আমার দুচোখ ছেড়ে চলে গেল।

পাটনায় আমরা তিন পুরুষের প্রবাসী বাঙালী। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন বিহারের ও অঞ্চলের বিধান রায়। বাবা এখনো ডাকসাইটে অ্যাডভোকেট। দুই পুরুষের জমানো সম্পত্তি আমার একটা জীবনেও ফেলে ছড়িয়ে বোধহয় শেষ করতে পারব না। কত বড় বড় কনেকশান আমাদের। দিল্লীর দরবার ইস্তক ছড়ানো। তবু শেষ চেষ্টা, ভাই ব্যাঙ্ক থেকে এক জোড়া চোখ পেতে আমাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হল। রক্ত বললেই যেমন রক্ত, ব্লাড-গ্রুপ মিলতে হয়, চোখ বললেই তেমনি চোখ নয়। আমাদের দেহকোষ বা সেলের আধার যে টিস্যু, তার স্বভাব, তার চরিত্রও বিচিত্র। ফরেনবডিকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। বোধহয় তারও পছন্দ অপছন্দ আছে।

শেষ পর্যন্ত তেমন চোখ পাওয়া গেল। অপারেশনও সাকসেসফুল হল। আমি আবার তাদের মতই দৃষ্টি ফিরে পেলাম। আগে লেখাপড়া করার জন্যে চশমার দরকার হত, এখন হয় না। চোখ ভাল হল, কিন্তু চশমা বেচারি ইনভ্যালিড হয়ে গেল, তার চোখ হারালো। আমি খুশী, আমার যেন পুনর্জন্ম হল। আমি আবার পুরনো কাজে বহাল হলাম।

দিন যাচ্ছিল তর তর করে, ভালই। কিন্তু কোথায় যে ছন্দ কেটে গেছে টের পাইনি তখনও। আসলে আমার স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন আনছিল! চির ধরছিল মনের মধ্যে। সব মানুষের মনের মধ্যেই হ্যাঁ আর না থাকে। অর্থাৎ এক মনের মধ্যে দুই মন। এক মন যাতে সায় দেয়, অন্য মন তাতেই বাগড়া দিতে চায়। তবে এটা খুবই অস্পষ্ট

আকারে এবং কখনো কদাচিৎ, তাই তেমন করে বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু আমার কেস আলাদা, দুটোই সমান জোরালো। থেকে থেকে টাগ অফ ওয়ার লেগে যায়। এর ফলে কিনা জানি না, আমি ক্রমশ কেমন রাগী হয়ে উঠছিলাম।

এই সময় অফিস থেকে আমাকে কলকাতায় পাঠাতে চাইল। আগের দিন হলেই নিশ্চয়ই এই বদলিতে রাজী হতাম না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার জন্যে আমার মনটা কেমন নেচে উঠল। চলে এলাম, বাড়ির অমত সত্ত্বেও। বাসাও ভাড়া নিলাম একটা। কিন্তু কলকাতায় এসে একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিল আমার চোখে থেকে থেকে ডবল ভিসন দেখতে লাগলাম, ডবল ইমেজ বললে স্পষ্ট হবে কথাটা। প্রথম দিনের কথাই বলি। কলকাতায় সেটা আমার দ্বিতীয় দিন। একটা রাস্তা দিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল একটা চেনা দোকান দেখে। থরে থরে কাচের শোকেসের ওপিঠে যে লোকটি বসেছে সে আমার বহুদিনের চেনা। এমনকি তার পেছনের ক্যালেণ্ডারের ছবিটি পর্যন্ত। মনে পড়ল এই দোকানে কতদিন সরপুরিয়া খেয়েছি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। মাইগড! একি দেখছি। ক্যালেণ্ডারের শালটি ১৯৪৭। ঠিক দশ বছরের পুরনো। এরকম ঝকঝকে দোকানে এক পুরনো ক্যালেণ্ডার? চোখ রগড়ে তাকালাম। দৃষ্টি বিভ্রম ছুটে গেল। দেখলাম, না। ১৯৪৭ সালেরই ক্যালেণ্ডার। আর ছবিটা আদৌ আমার চেনা নয়। চেনা নয় ক্যাশবাক্স আগলে বসা লোকটাও। আর সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, কাঁচের শোকেসের রসগোল্লা সন্দেশ সরপুরিয়া কোন ভোজবাজীতে রুপোর গয়না হয়ে গেছে। ঝকমকে বাউটি, কানপাশা, টায়রা, কাঁকই। যেন ইলেকট্রিক শখ খেলাম। খেয়াল হল এই রাস্তায় জীবনে এই প্রথম পা রেখেছি। আসলে কলকাতায় এই আমার স্বচক্ষে আসা। এর আগেও একবার অবশ্য এসেছিলাম, মাস কয়েক আগে। সে তো সোজা হাসপাতালে, অন্ধ অবস্থায়। আই গ্র্যাফটিংয়ের পর কালো চশমা পরে সোজা দমদম এয়ারপোর্ট। সুতরাং

চেনা লাগবার আদপেই কোনো রাস্তা নেই।

আমাকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কি চাই আপনার, বলুন দেখাচ্ছি।

আমি ঢোক গিলে বললাম, এখানে কাছে পিঠে একটা মিষ্টির দোকান ছিল না?

ছিল, কিন্তু এখন নেই। লোকটা হাসল, আপনি বোধহয় অনেককাল এ পাড়ায় আসেননি?

কেন বলুন তো?

এইটেই মিষ্টির দোকান ছিল। বছর দুই আগে—

লোকটিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন। কিন্তু পর পর আরও গুটি তিনেক ঘটনা ঘটল সেই দিনই। সবই দৃষ্টি বিভ্রমের। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। উলটো পা-টা, রহস্যময়। সে সব ডিটেলস বলে আপনাকে বোর করব না! তবে কথাটা এই, রীতিমত ভড়কে গেলাম। কেমন মনে হল চোখ খারাপ হয়েছে, তাই এরকম ইলিউশন দেখছি। বোধহয় চশমাই নিতে হবে।

একজন নাম করা আই স্পেশালিষ্টের কাছে গেলাম। তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করে বললেন, আপনার চোখের স্বাস্থ্য বোধহয় আপনার থেকেও ভাল। আপনি বরং অমুক ডাক্তারের সঙ্গে আজই দেখা করুন। ওঁর চিঠি নিয়ে সেখানে গেলাম। তিনি সাইকিয়াট্রিষ্ট। সাদা বাংলায় পাগলের ডাক্তার। আমাকে নানাভাবে বাজিয়ে দেখলেন। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, দূর মশাই, আপনার চোদ্দ পুরুষে কেউ পাগল নয়। সাধের পাগল না সেজে সোজা বাড়ি যান। একটা ঘুমের বড়ি দিচ্ছি। সেটি গিলে একখানা উনিশ রীলের ঘুম লাগান। দেখবেন ফ্রেশ হয়ে গেছেন।

ঘুমের বড়ি আর হালকা মন নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম সেদিন। কিন্তু সব মাটি করে দিল একখানা আয়না। দাড়ি কামানো আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। শির শির করে উঠল শিরদাঁড়ার ভেতরটা। কি দেখলাম জানেন? নিশ্চয় জানেন। একটু

আগে আমার চোখে আপনি যা দেখেছেন ঠিক তাই।

তারপর সে রাতে ঘুমের বড়ি খেয়েও কোন লাভ হল না। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মত টুকরো টুকরো তন্দ্রা মাখা ঘুম ভেসে যেতে লাগল চোখের ওপর দিয়ে। প্রতিবারই জেগে উঠে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে আর একটা লোক শুয়ে আছে আমার পিছনে। তার গায়ে অসম্ভব তাপ, যেন পুড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ছটফট করছে লোকটা। থেকে থেকে তার ছোঁয়া লাগছে আমার গায়ে। সে ছোঁয়া কি রকম জানেন। বোবায় ধরলে, কিংবা হঠাৎ ভূতের ভয় পেলে যেরকম গাটা ভারি হয়ে যায় সেই রকম।

পরদিন ধুম জ্বর নিয়ে জ্ঞান ফিরল যখন, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। এক সহকর্মীর বাড়িতে দিন দুয়েক কাটিয়ে তারই চেষ্টায় উঠে এলাম এই মেসে। এখানে অন্তত একা থাকতে হবে না। সিঙ্গল সীটের রুম দিতে চেয়েছিলেন ম্যানেজার, নিইনি। আমার ঘরে আর একজন ভদ্রলোক আছেন।

* * *

দীপক ব্যানার্জীর গল্পটা এইখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু হল না, ভূপতি আর আমি কি করে ওর গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। নলিনাক্ষ অবশ্য সব শুনে বলেছিল, 'এটা বিজ্ঞানের যুগ। অলৌকিক গাঁজাখুরি গল্পের পেছনে তোরা যদি দৌড়তে চাস দৌড়ো, আমি ওসবের মধ্যে নেই। লোকটার হয় মাথার গোলমাল, নয়তো মিথ্যে বলছে।'

'মিথ্যে বলে লাভ?'

'এক একজন লোক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ওরকম মিথ্যে বলে। তাছাড়া অন্য ধান্ধাও থাকতে পারে।'

'কি ধান্ধা?'

'কি করে জানবো!' নলিনাক্ষ পাশ কাটিয়ে গেল। আমার অবশ্য ওরকম মনে হল না। দীপকের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু বুঝেছি

তাতে ওর মাথার গোলমাল থাকতে পারে কিন্তু মিছে কথা বলছে না। আর অন্য কোনো মতলব নিশ্চয়ই নেই। ভূপতি তো ওর কেসটা লুফেই নিল। তার থিওরির এমন কংক্রিট উদাহরণ একেবারে হাতের গোড়ায় এসে যাবে, এ যেন ভাবাই যায় না। সবচেয়ে সুবিধের কথা এই, আমাদের তিনজনের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে কোন লুকোচাপা নেই। দীপক জানে আমরা তার শুভার্থী, তার এই বিপদের দিনে আমরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত।

ভূপতির অনুমান এই নতুন চোখজোড়া থেকে দীপকের এই বিপত্তি শুরু হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন তবু থেকেই যায়। দৃষ্টি ফিরে পাবার পরেও কয়েকমাস দীপক পাটনায় ছিল। এই নতুন চোখের প্রতিক্রিয়া তাহলে তখন ঘটেনি কেন। সত্যি বলতে কি, কলকাতায় আসার ডবল ভিশন দেখার মত কোন ঘটনাই তার জীবনে ঘটেনি। কেন ঘটেনি? কলকাতায় এসেই বা কেন ঘটলো। এখানে এসে যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। সেই বাড়ি থেকেই কি তার ওপরে আলৌকিক কোন শক্তি ভর করল? যে শক্তি তাকে অতীতকে দেখার শক্তি যোগায় কোন কোন মুহূর্তে? একই রাস্তায় একই সঙ্গে অতীত এবং বর্তমানকে পাশাপাশি দেখতে পাওয়া অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ-পুরুষরা অতীত বর্তমানের পাশে ভবিষ্যৎকে দেখতে পান। ফিল্মের ডবল একসপোজারের মত শোনা যায় ট্রিপল একসপোজার। তিনটে ছবিই পরস্পরের মধ্যে গায়ে গায়ে সাঁটা। তবে ওসব পৌরাণিক গাল-গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া গেলেও দীপকের ব্যাপারটা কি? ভৌতিক কাহিনী? তাহলে তো প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করতে হয়।

ভূপতি কোন গল্পে সন্তুষ্ট হবার মানুষ নয়। বিজ্ঞানের মাপ-কাঠিতেই সে সব কিছু মাপতে চায়। তাই তার খুঁটিনাটি প্রশ্নের শেষ নেই। দীপককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করে আর নোট নেয়। কোন হাসপাতালে কবে তার অপারেশন হয়েছিল, কে অপারেশন করেছিলেন। তার পাটনার ঠিকানা, কলকাতায় সেই ভাড়া বাসার ঠিকানা। অসুস্থ অবস্থায় যে সহকর্মীর বাড়িতে ছিল। যে

চোখের ডাক্তার, যে সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে দেখেছিলেন তাদের সকলের নামধাম বিবরণ যেভাবে সে নোট করে নিল তাতে বুঝলাম ভূপতির সামনে এখন হাতে কলমে অনেক কাজ। মুখে কিছু না বলুক, তার অনুসন্ধানী অভিযান শুরু হয়ে গেছে। দীপকের গল্প আমি অবিশ্বাস করছিনা, কিন্তু সত্যি বলতে কি তার সঙ্গে আলাপ হবার পরে পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেছে অথচ ওরকম ঘটনা আর একদিনও ঘটেনি। ভূপতির কথা মত দীপক দিন দশেকের ছুটি নিয়েছে, কাজে বেরোচ্ছে না। এই কদিন আমি আর ভূপতি পালা করে ওর সঙ্গে সেঁটে রয়েছি। একসঙ্গে খাই, ঘুমোই, বেড়িয়ে বেড়াই। বসে বসে গল্প করি। কিন্তু কোন বিস্ময়কর ঘটনা পলকের জন্যেও ঘটেনি। নলিনাক্ষ প্রায় প্রতিদিনই আসে, দীপকের অলক্ষ্যে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে চলে যায়। আমরা কিছুই বলি না, বলার কিই বা আছে। হাতেনাতে প্রমাণ দেখাতে না পারলে অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করানো যায় না। উলটে বিশ্বাসী মানুষের মনও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসে। আমার মনের অবস্থা এখন খানিকটা সেই রকমই। দীপকের চোখ জোড়া দীপকের মুখের সঙ্গে মেলেনি, তার স্বভাবের সঙ্গে বেমানান হয়ে আছে—সেটা টের পাই। সেটা হতেই পারে, কারণ ওই চোখ ওর নিজের নয়, আর একজনের, বাইরে থেকে চেষ্টা করে জোড়া লাগানো। তাই এ-রকম মনে হতেই পারে। রাতের বেলায় এক আধ মুহূর্তের জন্যে ওর চোখের মধ্যে সবুজ আলোর ঝিলিক ভূপতিও দেখেছে। ওর চোখের ক্লোজ আপ ছবিও ভূপতি তুলেছে কয়েকখানা।

কিন্তু এতে কি প্রমাণ হয়? কিছুই না। অবিশ্যি সুস্থ মনে হলেও দীপক একেক সময় কেমন উল্টো পাল্টা ব্যবহার করে। দারুণ হাসাহাসি গল্প-গুজব চলছে হঠাৎ দীপক গম্ভীর হয়ে গেল, মিনিট দশেক গুম হয়ে বসে থাকল, একটি কথা বলল না। কিংবা দিব্যি বেড়াচ্ছি, আচমকা কি হল, কোন কথা না বলে ও হঠাৎ পিছন ফিরে হনহনিয়ে হাঁটা দিল। পরে এ নিয়ে কথা হলে ও অবাক হয়, ও

বিশ্বাস করতেই চায় না ও-রকম কিছু করেছে বলে। নলিনাক্ষ শুনে বলে, এ সবই শো বিজনেস বুঝলে।

আজকেও দুজনে বেড়াচ্ছিলাম। রোজ দুচার মাইল আমরা এভাবে হাঁটি। ভূপতি আজ দিন তিনেক কলকাতায় নেই। বোধহয় পাটনায় গেছে। আজকাল ও যে কি করে, কিভাবে, কিছুই ভেঙে বলে না। আমার ওপর শুধু একটা নির্দেশ রেখে গেছে, দীপককে যেন সব সময় চোখে চোখে রাখি। রাখছিও। আজকেও গল্প করতে করতে ফিরছিলাম। হঠাৎ একটা কাণ্ড হল।

ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অ্যামবাসাডার সবে চলতে শুরু করেছে এমন সময় দীপক গাড়ির মধ্যে কাউকে দেখতে পেয়েই পাগলের মত চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল। আমি ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে ফেলে বিদ্যুৎগতিতে সে গাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। গাড়িটাও থামল না, টপ স্পীডে বেরিয়ে গেল। আমি বোকার মত দীপকের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কিছুদূর পর্যন্ত দৌড়ালাম। শেষে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম রাস্তার মাঝখানে। ধারে কাছে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেও গাড়িটার পিছু ধাওয়া করতে পারতাম হয়তো, কিন্তু দরকারের সময়ে এই শহরে হাতের কাছে কিছুই পাওয়া যায় না। বহুক্ষণ দীপকের জন্যে অপেক্ষা করে শেষে মেসে ফিরে এলাম। কিন্তু সারারাত অপেক্ষা করেও যখন দীপক ফিরল না আমার দুশ্চিন্তা হতে লাগল। মনে হল কাল রাতেই আমার থানায় ডায়েরী করা উচিত ছিল।

থানায় যাবার জন্যে জামা কাপড় পরছি এমন সময় সেই ভোর সকালে ভূপতি এসে হাজির, মুখে চোখে ক্লান্তি। চুল উস্কোখুস্কো কিন্তু ঠোঁটে একটা সাফল্যের হাসি। এ সময় ও কখনো আসে না। তাই ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে কী ব্যাপার? কোথায় ডুব মেরেছিলি এই কদিন।'

ভূপতি উত্তেজিত গলায় বলল, 'সে অনেক কথা, পরে বলব। তবে আসল রহস্যের বোধহয় যবনিকা তুলতে পেরেছি। প্রথম থেকেই

আমি এরকমটাই সন্দেহ করেছিলাম।'

আমি নিজের কথা, দীপকের কথা সেই মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়ে সংক্ষেপে ভূপতির অনুসন্ধানের যে-কাহিনী শুনলাম সে সত্যি রোমাঞ্চকর। বছর খানেক আগের আমাদের কাগজের হেডলাইনগুলো আমার চোখে যেন ভেসে উঠল। কারণ সেগুলো আমিই লিখেছিলাম।

অনেকগুলো ডাকাতির মামলার ফেরারী আসামী ভাস্কর নস্কর ওরফে ফাণ্টাবাবুর হত্যার ব্যাপার নিয়ে তখন কলকাতায় ক'দিন খুব হৈ চৈ হয়েছিল। এই লোকটির শরীরে দুটি রিভলভারের বুলেট পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সে জন্য নয়। এক দল লোকের ধারনা হয়েছিল বেওয়ারিশ এই লোকটিকে দিয়ে আসামী সাজিয়ে পুলিস অন্য কোন বড় ব্যাপার ধামাচাপা দিতে চাইছে। পুলিস অবশ্য ফাণ্টাবাবুর খুনীকে ধরতে পারেনি, শুধু খুনীর ফেলে যাওয়া রিভলভার আর কয়েক ফোঁটা রক্ত আবিষ্কার করেছিল। খুনীর ব্লাড গ্রুপ আর আঙুলের ছাপ ছাড়া তাদের রেকর্ডে আর কিছু নথিপত্র হয়নি। এদিকে মুমূর্ষু লোকটি যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিল তা অভাবনীয়, মৃত্যুকালে সে তার দুটি চোখই আই ব্যাঙ্ককে দান করে গিয়েছিল। তার এই শেষ ইচ্ছার কারণ হিসেবে বলেছিল, সে এখনি মরতে চায় না। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চায়। প্রায় কবির মতই কথা। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' যাইহোক, ভাস্করবাবু ওরফে ফাণ্টাবাবু সত্যিই ডাকাত ছিল কিনা তা জানা না গেলেও সে যে অমানুষিক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল সে বিষয়ে ডাক্তাররা দ্বিমত হননি। ছ' ছ'টি বুলেট হজম করে, ফুসফুসে—হৃৎপিণ্ডে সরাসরি জখম হয়েও কোন মানুষ যে ঘণ্টাখানেক মৃত্যুর সঙ্গে সজ্ঞানে যুঝতে পারে এবং তার চোখ দুটো তুলে নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে পারে, তাদের কেতাবী বিদ্যায়-এর ব্যাখ্যা নেই।

কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় খবর ফাণ্টাবাবুর এই চোখ দুটিই শেষ পর্যন্ত দীপকের কপালে জুটেছিল।

ভূপতির মুখে দীপকের নাম শোনা মাত্র আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ভূপতিকে ওর নিরুদ্দেশের খবর বললাম।

ভূপতি চমকে উঠে বলল, 'সে কি! থানায় ডায়েরী করেছিলি? অ্যাঁ তাও করিসনি, যাঃ ইডিয়েট! গাড়িটার রং আর নম্বরও নিশ্চয় এতক্ষণে ভুলে মেরে দিয়েছিস? না!'

কালো রং আর আমার একটি প্রিয় সংখ্যা পরপর চারবার ব্যবহার হওয়ায় নাম্বার প্লেট মনের মধ্যে জ্বল জ্বল করছিল। ছুটলাম লোকাল থানায়, সেখান থেকে লালবাজারে, তারপর দক্ষিণ কলকাতার এক হাসপাতালেই কাল রাতে যে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির আহত ও সংজ্ঞাহীন দেহ পুলিস রাস্তা থেকে হাসপাতালে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল তাকে দীপক ব্যানার্জী বলে সনাক্ত করে আমরা ফের ছুটলাম ভূপতির এক্স-পেশেণ্ট এবং প্রায় বন্ধুস্থানীয় ব্যারিস্টার ডি. আর মিত্রর কাছে। আইন আদালতের খবরে যাঁদের বিন্দুমাত্র কৌতূহলও আছে তাঁরাই মিত্র সাহেবকে নামে এবং কাহিনীতে চিনবেন। অপরাধীদের কাছে এই ক্ষুরবুদ্ধি আইনজীবী মানুষটি ডিয়ার তো নন-ই, মিত্রও নন। লোকে রসিকতা করে বলে, ইংরেজী ডেনজার শব্দের আদি এবং অন্তের অক্ষর দুটি নিয়ে ধ্রুব রঞ্জনের ডি. আর।

রূপকথার গল্পের মতই দীপকের গল্পও এইখানে শেষ। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে মেসে ফিরে এসেছিল। তবে রাজসাক্ষী হয়ে তাকে যথাসময়ে কোর্টে হাজির হতে হয়েছিল। কারণ আমার দেওয়া গাড়ির নম্বর, আর তার দেওয়া মোটর আরোহীর বিবরণের সঙ্গে পুলিস বছর খানেক আগে তুলে রাখা আঙুলের ছাপ আর রক্ত মিলিয়ে ফাণ্টাবাবুর হত্যাকারীকে হাত কড়া পরিয়েছিল! সে অনেক ঘটনা এখন। তবে দীপকের চোখ আর তাকে কোনদিন ট্রাবল দেয়নি। কিন্তু ভূপতির থিওরি এইখানে এসেই আচমকা একটা ধাক্কা খেয়েছে।

রহস্যের হোমটাস্ক

গরমের ছুটির দুপুরবেলা আর যেন কাটতে চায় না। বাবা-কাকারা সবাই অফিসে, মাও রান্নাঘর সেরে এসে গল্পের বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যখন ঘুমে তলিয়ে যায় তখন সারাবাড়ি নিঃঝুম। রোদে পোড়া ছাদ রাস্তা মাঠ ঘাট খাঁ খাঁ করে। নিমগাছের পাতার ছায়ায় দু-একটা একলা-কাক নিরিবিলিতে ঝিমোয়। কোনো রকের ছায়ায় ইরানি বাসনওলি তার বোঝা নামিয়ে হয়তো বিশ্রাম করে। সব মিলিয়ে যেন দিনদুপুর নয়, রাতদুপুর।

কুট্টুদের চিলেকোঠার ঘরে কিন্তু চার খুদে গোয়েন্দার চোখে ঘুম নেই। প্রতিদিনের মতো আজও তাদের গোপন অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে। হাতে কোনো কাজ নেই, কিন্তু কাগজ আছে। খবরের কাগজের খুন ডাকাতি ব্যাঙ্কলুটের তরতাজা খবরগুলো নিয়েই তারা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। তর্ক বিতর্ক আলোচনায় ঘরের হাওয়া আরও গরম হয়ে ওঠে। ঘরে বসেই মুখে মুখে তারা রহস্যের কিনারা করার চেষ্টা করে, সাধ্যমতো সমাধানে পৌঁছায়।

গল্পের বই পড়তে পড়তেই এই মজার খেলার আইডিয়াটা সুনন্দর প্রথম মাথায় আসে। সে ভাবে, আমাদের নাইবা থাক বন্দুক পিস্তল, কেউ আমাদের ডেকে নাইবা দিল তদন্তের ভার। অন দ্য স্পট মানে অকুস্থলে আমরা নাইবা পৌঁছোলাম সশরীরে। কিন্তু মনে মনে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি, যেখানে খুশি যখন খুশি যেতে পারি। কেউ আমাদের নিষেধ করতে পারবে না। পথ আটকে কৈফিয়ত চাইবার সাধ্যও নেই কারো। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে আসল অপরাধীকে আমরা খুঁজে বের করবই। কেউ তাকে আমাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

সেই থেকে এই প্রতিদিনের খেলায় মেতে উঠেছে ওরা চার বন্ধু। বন্ধু হলেও ওরা আসলে চার ভাই, মামাতো, পিসতুতো, বয়সে কিছু ছোট-বড়ও হবে, এক ইস্কুলে, কিন্তু এক ক্লাসে পড়ে না সবাই। কিন্তু এই গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে ওদের চিন্তা-ভাবনা প্রায় একই রকমের। চারজনেই রহস্য রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার গল্পের পোকা। চারজনেই সমান বুদ্ধিমান। সাহসেও কেউ কম যায় না।

'জোড়া খুন আর জোড়া খুন!' কুট্টু খবরের কাগজখানা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বলল, 'আজকের কাগজেও একজোড়া খুনের খবর ফলাও করে লিখেছে।'

বাবুয়া হাসল, 'এ সবই পুরনো ব্যাপার হয়ে গেছে। আমি কাগজ না পড়েও বলতে পারি, কেউ গ্রেপ্তার হয়নি এবং পুলিশ আত্মহত্যা বলেই সন্দেহ করছে।'

বুবুন বলল, 'যা বলেছ বাবুয়াদা, সেই পুরনো টেকনিক, সেই পুরনো যুক্তি। আসলে পুলিশের এখন দর্শকের ভূমিকায় রেস্ট নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

সুনন্দ বলল, 'বাবা বলেন, এটা নাকি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিটিশনের যুগ। মানে, ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতার হুজুগ। যাকে বলে দেখাদেখির পাল্লা। ঠিকই বলেন, একজন মাথা খাটিয়ে যেই একটা জিনিস বের করল অমনি তার পাশাপাশি সেই রকম জিনিস বেরিয়ে বাজার ছেয়ে গেল। একই মাল, শুধু লেবেল আলাদা। টেপরেকর্ডার, টেলিভিশন, ভি.ডি.ও. দেখ, রান্নার সরঞ্জাম দেখ, ওষুধ কোম্পানির ওষুধ থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত দেখ। পত্রিকার পাতা ওল্টালেই রাশি রাশি পাশাপাশি বিজ্ঞাপন দেখতে পাবে, এ বলছে আমারটা দেখুন, ও বলছে আমারটা দেখুন। ভাল, আরও ভাল, সবচেয়ে ভাল।'

কুট্টু গম্ভীর ভারিক্কে গলায় বলল, 'বাবাইয়ের (সুনন্দর ডাকনাম) কথার মানেটা খুব স্পষ্ট হল না কিন্তু! ও যে এত উদাহরণ দিয়ে কী বোঝাতে চাইছে তা আমার এই নিরেট মাথায় ঠিক প্রবেশ করল না।'

সুনন্দ হেসে ফেলে বলল, 'গোয়েন্দা কুট্টুপ্রসাদ, আপনার একটু

ডাইনে-বাঁয়ে চিমটি কাটার অভ্যেস আছে আমি জানি—'

'আহা আহা, নিজেদের মধ্যে আবার ল্যাং মারামারি কেন!' বাবুয়া বলে ওঠে, 'শখের প্রাণ গড়ের মাঠ বলে একটা কথা আছে জানো তো? তোমরা, মানে আমরা সবাই হচ্ছি শখের গোয়েন্দা—আমাদের মন-প্রাণ একটু উদার আর বড় হওয়া দরকার। বাবাই কী বলতে চেয়েছে, আমিই বলছি, শোনো। ও বলেছে, এখন হচ্ছে দেখাদেখির কম্পিটিশন। তাই একটা অপরাধ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধরনের অপরাধ আরও ঘটতে শুরু করেছে। এক ফর্মুলা, একই ধরনের ফিনিশিং টাচ। জোড়া খুন তো জোড়া খুন, ছেলেচুরি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, কেপমারি—একটার নকল করে আর একটা। ঠিক, বাবাই ঠিকই বলেছে—' হঠাৎ কথা থামিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে বাবুয়া উৎকর্ণ হয়ে কী শুনতে লাগল। শব্দটা ততক্ষণে ওরা সবাই শুনতে পেয়েছে। একটা ভারী জুতোর মসমস শব্দ। দোতলার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসছে।

কান পেতে আওয়াজটা শুনে কুট্টু চাপা গলায় বলল, 'না, পুলিশ না। ওদের বুটের আওয়াজ অন্যরকম হয়, ভোঁতা ভরাট ভারী—একটু রাগী রাগী।'

বুবুন বলল, 'একজাক্টলি। সেই সঙ্গে একটু অসাবধানী, বেপরোয়া।'

সুনন্দ বলল, 'গল্পের বইতে দেখা যায়, ঠিক এ-রকম সময়ে সাধারণত ডিটেকটিভদের কাছে তাদের মক্কেলরা আসে, নতুন মামলার আবেদন নিয়ে।'

'আর ব্যোমকেশ বক্সী কিংবা শার্লক হোমস তার সহকারীকে সেটা চোখ বুজে বলে দেয়। আর একটু পরেই দেখা যায় তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। লেট আস ট্রাই। কুইক।' বাবুয়া বলে।

সুনন্দ বলল, 'আমি সকলের শেষে বলব।'

কুট্টু বলল, 'আওয়াজটা বুটের নয়। ভারী জুতোরও নয়। আওয়াজটা ভারী শরীরের। আসছেন মাথায় গেরুয়া পাগড়ি বাঁধা

এক শেঠজি। সিন্দুক থেকে জহরতের থলে উধাও।'

'নেক্সট।' বাবুয়া রেফারির মতো নির্দেশ দেয়।

বুবুন বলল, 'যিনি মক্কেল হয়ে আসছেন তিনি আমাদের নমস্য ব্যক্তি। তাঁর পায়ে বুট, গলায় নেকটাই। এক টাকারও কম দামি একটা জিনিস খোয়া যাওয়ায় তিনি দিশেহারা। আসছেন কুট্টুর কাছে।'

কুট্টু চমকে উঠে বলল, 'কে?'

বাবুয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী সেই জিনিস?'

বুবুন দোনলা বন্দুকে যেন দুজনের দিকে দুটো উত্তর ছুঁড়ল, 'কুট্টুস ফাদার স্টেটসম্যান পত্রিকা। অফিস থেকে একটু বেটাইমে ফিরেছেন আজ।'

'আমি বলছি।' বাবুয়া দুষ্ট হেসে বলল, 'যিনি আসছেন তিনি প্রায় এসেই পড়েছেন, এক্ষুনি তাঁকে আমরা দেখতে পাব, আমি এর বেশি বলতে চাই না। নেক্সট।'

'কমলেশকাকা।' সুনন্দ বলল, 'আসছেন লং জার্নি করে। একটা খুনের স্পট থেকে।'

সুনন্দর কথা শেষ হবার পর পাঁচ থেকে সাত সেকেণ্ডের মধ্যেই সত্যি সত্যি গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এবং সুনন্দর বাবার বন্ধু কমলেশ রায়ের আবির্ভাব ঘটল। বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে ওঠা সকলের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, 'কারেক্ট। এভরিথিং কারেক্ট। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, দুর্গাপুর থেকে সোজা আসছি, হাণ্ড্রেড কিলোমিটারস অ্যান আওয়ার, গলা শুনে মনে হল সুনন্দ তুমি বলেছ কথাটা। কিন্তু কী করে বললে?'

সামান্য সঙ্কোচের সঙ্গে সুনন্দ বলল, 'শুনলে আপনি হাসবেন।'

'কক্ষনো হাসব না, তুমি বলো।'

সুনন্দ ওরফে বাবাই আঙুল দিয়ে তিনতলার সিঁড়ির বাঁকের মুখের দেওয়ালে টাঙানো বিশাল ল্যাণ্ডস্কেপখানা দেখিয়ে বলল, 'ওই

ছবির কাঁচের মধ্যে আপনার ছায়া দেখতে পেয়েছিলুম। আর সেটা দেখতে পাব জেনেই সব শেষে আমি বলতে চেয়েছিলুম।'

কুট্টু বোকা বনে গিয়ে রেগেমেগে বলল, 'চোট্টা গোয়েন্দা।'

কমলেশকাকা হাত তুলে বললেন, 'আহা, সবটুকু আগে শুনতে দাও, পরে বিচার হবে। বলো সুনন্দ, শেষ করো।'

'একটা গাড়ি এসে থামার আওয়াজ আমি আগেই শুনেছিলাম।' সুনন্দ একটু থেমে বলল, 'তারপরেই বনেট খোলার আওয়াজ। একটানা অনেকটা পথ গাড়ি ছুটিয়ে এলে ইঞ্জিন গরম হয়ে যায় বলে অনেক সময় দেখেছি ড্রাইভাররা বনেট তুলে দেয়। তাই অনুমান করে নিয়েছিলাম যিনি আসছেন, অনেক দূর থেকে একটানা আসছেন। আমার দ্বিতীয় অনুমান আপনাকে দেখতে পাওয়ার পর। খুব সিরিয়াস কোনো প্রবলেম ঘটলে, এর আগের অনেকগুলো ঘটনায় আমি দেখেছি, আপনি ব্রেনটাকে রেস্ট দেবার জন্যে আমার সঙ্গে হালকা চালে আলোচনা করতে আসেন। তাই মনে হয় খুনটুনের মতো গুরুতর কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই এর পেছনে আছে।'

মেঝেতে শেতলপাটি বিছিয়ে ওরা বসে ছিল এতক্ষণ, কমলেশকাকা ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়েছিল সবাই। বাবুয়া চট করে ঘরের কোণ থেকে একখানা চেয়ার টেনে এনে ওঁর সামনে পেতে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

কমলেশকাকা চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ, চমৎকার। না, এই চেয়ারের কথা বলছি না, গোয়েন্দা সুনন্দর কথাই বলছি। সেইসঙ্গে তোমাদের সকলকেই বলছি। সুনন্দ যা পেরেছে, তোমরা প্রত্যেকেই তা পারতে, কিন্তু পারোনি। কেন পারোনি জানো? শুধু সজাগ ছিলে না বলে। স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান—সে তোমাদেরও ছিল, শুধু অ্যাপ্লাই করোনি। ভাল গোয়েন্দা হবার কতকগুলো শর্ত আছে। প্রথমত তোমাকে পরিবেশ-পরিস্থিতি-সচেতন হতে হবে। তুমি যেখানে আছ, তার চারপাশ তোমাকে সকলের আগে খুঁটিয়ে দেখতে

হবে। আর তা করতে হলে নাকে কানে চোখে খাটো হলে চলে না। সামান্য শব্দ, সামান্য গন্ধ কিংবা এক বিন্দু দাগও অনেক সময় অনেক কথা বলে, অনেক সংকেত রেখে যায়। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝে নিতে হয়। আসলে গোয়েন্দাদের কাছে কিছুই ফেলনা নয়, সামান্য একটা পোড়া দেশলাই-কাঠি কিংবা ভাঙা বোতাম না-দেখা ঘটনার সাক্ষী হতে পারে। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই তোমাদের খেলাটা ধরতে পেরে গেছি। ভাল, খুব ভাল। এভাবেই রাফখাতায় হাত পাকাতে হয়।'

সুনন্দ ভাবল, বাড়ির সবাই যদি কমলেশকাকার মতো হত তাহলে তাদের আর কোনো দুঃখই থাকত না। কিন্তু মানুষ বড় হয়ে গেলে ভুলে যায় তারাও একদিন ছোটই ছিল, পদে পদে কেবল শুনতে হয়েছে এটা কোরো না, ওটা কোরো না।

চার খুদে গোয়েন্দার মাঝখানে চেয়ারে বসে কমলেশ রায় ধীরে-সুস্থে একটা চুরুট ধরালেন, তারপর মজার মুখ করে বললেন, 'পাঁচ-মাথার মোড় কোথায় আছে জানো?'

বুবুন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কলকাতার শ্যামবাজারে।'

'গুড। আর কোথায়?'

চার বন্ধু মাথা চুলকোতে লাগল। সুনন্দ ধর্মতলার কথা বলতে গিয়েও সামলে নিল। ওখানে পাঁচটা রাস্তা মিশেছে বটে কিন্তু একটু খুঁত থেকে গেছে, কাটাকুটিটা ঠিক এক পয়েন্টে এসে হয়নি, একেবারে শেষ মুহূর্তে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটকে ল্যাং মারতে গিয়ে ব্যাপারটা কাঁচিয়ে দিয়েছে। কমলেশকাকা সুনন্দর চোখের টুনি বাল্‌বের জ্বলে উঠেই নিবে যাওয়া লক্ষ করে মুচকি হেসে বললেন, 'ঠিক তাই। এখানেও সেই একই ব্যাপার ঘটেছে, বুঝলে সু! আমরা পাঁচমাথা এক জায়গায় মিললেও আমি একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি। মার্ডার কেসটায় আগে পৌঁছে গেছি। সুতরাং এ-ঘরে নিখুঁতভাবে বলতে গেলে চৌমাথা এক হয়েছে। তোমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো হচ্ছে এক-একটা পৃথক রাস্তা। এই চৌরাস্তার মোড়ে

এবার আমি একটা জটিল অঙ্ক হোমটাস্ক হিসেবে রেখে যেতে চাই। তোমরা এর নির্ভুল সমাধান খুঁজে বের করো।'

'এক মিনিট।' কুট্টু উঠে দাঁড়িয়ে কথাটা বলেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে দৌড়ল। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে কমলেশ রায় ভুরু কুঁচকে চুপচাপ চুরুট টানতে লাগলেন। এক মিনিটের আগেই কুট্টু হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল, 'ভজুদাকে চা করতে বলে এলাম আপনার জন্যে। এবার বলুন।'

'শাবাশ গোয়েন্দা! এই তো মনের কথা বুঝতে শিখেছ, আমার মন এখন এক পেয়ালা চা-ই চাইছিল। আচ্ছা, এবার শোনো আমার কাহিনী।' কমলেশকাকা কয়েক সেকেণ্ড থেমে ব্যাপারটা গুছিয়ে নিলেন পাকা গোয়েন্দা-লেখকের মতো, 'হ্যাঁ, সংক্ষেপে গল্পের আউট-লাইনটা এইরকম। দুর্গাপুরে আমি যে বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম সেখানে কাল বিকেলে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান আর খাওয়াদাওয়া ছিল। এই পরিবারটি অত্যন্ত পাংচুয়াল, ছোটবড় সবাই ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। বাড়ির বড় ছেলে সুমিত স্টিল প্ল্যাণ্টে কাজ করে। ওর দুটি সহকর্মী-বন্ধুকে ও এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেছিল। তারা আবার দুজনেই শিল্পী, একজন ভাল ম্যাজিক দেখায়, অন্যজন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। বিয়ে-থা করেনি, একই জায়গায় মানে একটি কোয়ার্টারে মেস করে থাকে। সুমিত বলল, কাকু চলুন, গাড়ি করে ওদের নিয়ে আসার কথা আছে। আপনি গেলে আর পাশের বাড়ির সাহায্য নিতে হয় না। আপনারও ওই অঞ্চলটা দেখা হয়। গাড়িতে সুমিতকে নিয়ে বেরোলাম। ছ'টায় অনুষ্ঠান, দু-এক চক্কর এদিক-ওদিক ঘুরে, সুমিতের দেওয়া কথামতো ঠিক পৌনে ছ'টায় গিয়ে ওদের কোয়ার্টারের সামনে হর্ন বাজালাম। দরজা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে, যেন অপেক্ষাই করছিল। সতীকান্ত, যার আজ ম্যাজিক দেখাবার কথা, সে দেখলাম স্যুটে বুটে তৈরি। ভেতরে ডাকল আমাদের। বসবার ঘরে বসিয়ে বলল, মুশকিল হয়েছে, ব্রজেন সেই দুপুরে দুর্গাপুর স্টেশনে কাকে রিসিভ করতে বেরিয়েছিল, এখনো ফেরেনি। বলেছিল পাঁচটার

মধ্যে অবশ্যই ফিরবে, কিন্তু এখনো তো—। সুমিত নিজের হাতঘড়ি দেখে দুঃখিত গলায় বলল, তাহলে? এদিকে তো পৌনে ছটাও বেজে গেল, আর অপেক্ষা করা যায় না। সতীকান্ত বলল, ঠিক আছে, এক কাজ করি বরং। একটা চিঠি লিখে রেখে যাই। একটা প্যাড টেনে খসখস করে চিঠিটা লিখে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল, দেখুন তো, এই রকম লিখলাম, এতেই হবে, কী বলেন? দেখার কিছু ছিল না, দু লাইনের চিঠি। ফিরেই সঙ্গে সঙ্গে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়িস, আমরা এগোলাম। সতীকান্ত। যে টেবিলে তাস ছড়িয়ে বসে পেশেন্স খেলছিল এতক্ষণ, সেখানেই একটা অ্যাশট্রে চাপা দিয়ে চিঠিটা রেখে সতী বলল, আপনারা এগোন আমি আসছি। বেরিয়ে গাড়ির কাছে এলাম। ম্যাজিক দেখবার ব্যাগটা আলমারি থেকে বের করে নিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে সতী বেরিয়ে এল। দরজায় ডোর ল্যাচ বসানো, টেনে দিলে আপনা থেকেই তালা বন্ধ হয়ে যায়। আমার কাহিনীর প্রথম দৃশ্যের এখানেই সমাপ্তি।'

কমলেশকাকা চুরুট নিভে যাওয়ায় থামলেন। দেশলাই জ্বেলে দুটো টান দিয়ে ফের বললেন, 'কিন্তু গাইয়ে ব্রজেন বসু কথা রাখল না, এল না। সতীকান্তর অনুরোধে ব্রজেনের সন্ধানে যাকে পাঠানো হয়েছিল সে সাতটা নাগাদ সাইকেলে করে ফিরে এসে জানাল যে, সতীকান্তদের কোয়ার্টারে আলো জ্বলছে পাখা ঘুরছে, বোধহয় একটা টেপ রেকর্ডারও বাজছে ভেতরের ঘরে কিন্তু বারবার কলিং বেল টিপে আর দরজা ধাক্কিয়েও কারো সাড়া পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। আমি, সুমিত আর সতীকান্ত তক্ষুনি বেরোলাম গাড়ি নিয়ে। চাবি ঘুরিয়ে সতীকান্ত দরজা খুলল। বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। কেউ নেই। টেবিলের ওপরে অ্যাশট্রের তলা থেকে সেই চিঠিটা অদৃশ্য। ভেতরের ঘর থেকে গানের আওয়াজ আসছিল। আমরা ছুটে গেলাম। এই দ্বিতীয় দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ঘরের মেঝেয় ব্রজেন পড়ে আছে লুটিয়ে, হুমড়ি খেয়ে। পরনে দামি ট্রাউজার্স, কিন্তু মুখ দেখা যাচ্ছিল না, নাইলনের একটা সুদৃশ্য

নেভিকাট গেঞ্জিতে মুখখানা ঢাকা। বোধ হয় গা থেকে গেঞ্জিটা যখন খুলছিল সেই বেকায়দা মুহূর্তে কেউ লোহার রড বা স্টিলের পাত দিয়ে পিছন থেকে ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত করছিল। ফলে শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেনের মৃত্যু হয়।'

কমলেশ রায়কে আবার থামতে হল। কারণ এই সময় ভজনলাল ওরফে কুট্টুর ভজুদা প্রায় গন্ধমাদনের সাইজের একটা বিশাল ট্রে ঘাড়ে করে আবির্ভূত হল। ট্রের ওপরে একগাদা গেলাস, গুটি পাঁচেক প্লেট আর একটি চায়ের কাপ, যেন খাদ্য ও পানীয়ের এক ধূমায়িত কলোনি।

'তোমাদের জন্যি কিন্তুক চায়ের হুকুম নাই, বরনভিটা আনিচি।' তরমুজের বিচির মতো এক সার দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ভজনলাল চলে গেল। বাবুয়া ওদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় আর এসব ব্যাপার ম্যানেজ করতে ওস্তাদ। একটা বড় টিপয় টেনে এনে মিনিট-দেড়েকের মধ্যেই সে হাতে হাতে বিলিব্যবস্থা করে ট্রে খালি করে ফেলল।

সুনন্দ বলল, 'কমলেশকাকা, আপনি চা খেতে খেতেই বলুন।'

'হ্যাঁ বলি। তোমরা যেহেতু সেখানে কেউ যাওনি, এবং যাবার সম্ভাবনাও নেই, তাই আমি আমার প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট এবার জানাই। ব্রজেনের পকেট থেকে মাত্র তিনটে জিনিস পাওয়া গিয়েছে। মানিব্যাগ, সদরের চাবি আর সতীকান্তর লেখা সেই চিঠিটা।'

কুট্টু জিজ্ঞেস করল, 'আর কিচ্ছু না?'

'না। এক কুচি সুপুরি কি একটা লবঙ্গ পর্যন্ত না। মানিব্যাগের মধ্যে গুটি পঞ্চাশ টাকা আর একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট ছিল। ঘরে অনেক তল্লাসি করেও দুটো জিনিস খুঁজে পেলাম না। এক নম্বর—হত্যার সেই অস্ত্রটি, আর থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখা খবরের কাগজের ভেতর পরশুদিনের আগের দিনের কাগজটা। কী ছিল সেই কাগজে? ওই তারিখের কাগজে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কাজে লাগতে পারে

এমন কোনো খবর কিংবা ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন কিছুই পাইনি।'

'কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য?' বুবুন হঠাৎ একের পর এক প্রশ্ন তোলে, ব্রজেনবাবু কি খুব বড়লোক ছিলেন? ওঁর কি খুব দামি জিনিস কিছু খোয়া গেছে? ওঁর কি অনেক টাকার লাইফ ইন্সিওর, ব্যাঙ্কে অনেক টাকা, দেশে অনেক জমিজমা সম্পত্তি ছিল?'

'ঠিক তার উল্টো।' কমলেশকাকা গম্ভীর মুখে বললেন, অনেকভাবে যা খবর সংগ্রহ করেছি তা হচ্ছে, ওর নিজের এবং বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, শুধু মাইনের টাকায় সংসার চলত।'

'কোনো শত্রু?'

'না।'

সুনন্দ এবার বলল, 'ব্রজেনবাবু আর সতীকান্তবাবু দুজনে খুব বন্ধু ছিলেন?'

'হ্যাঁ, বন্ধুই ছিল। দুজনের স্বভাব দু'রকমের হলেও কখনো মতের অমিল কিংবা ঝগড়া হয়নি।'

'দু'রকমের স্বভাব বললেন কমলেশকাকা? কী রকমের দু' রকমের?'

'ব্রজেন শান্ত, লাজুক, পড়ুয়া আর অন্যমনস্ক ধরনের। বই কেনা, লটারির টিকিট কেনা আর রেকর্ড কেনা ছাড়া কখনো বাজে পয়সা খরচা করত না। কোনো নেশাও ছিল না। আর সতীকান্ত খুব হিসেবি, চালাক, তার আছে সিগারেট আর মাছ ধরার নেশা। ডাকটিকেট জমানো হবি। তাসের নেশা, ম্যাজিক দেখাতে সে খুব ভালবাসে। বাড়ির অবস্থাও ভাল। খবরের কাগজ ছাড়া আর কিছুই পড়ে না। আসর জমাতে ওস্তাদ।'

এর পর বেশ কিছু সময় নিঃশব্দে কাটল। খাদ্য আর পানীয়ের সদ্ব্যবহারে ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মনে হলেও সবাই তখন মনে মনে ধাঁধা দেখছে আর আকাশ-পাতাল ভাবছে। তাজ্জব ব্যাপার, একটা মানুষ এত সহজে, প্রায় বিনা কারণে খুন হয়ে যায় আজকাল! অথচ আগেকার দিনের মতো খুনি ভুলেও একটা ক্লু ফেলে যায় না।

যেন সব কিছু চেঁছেমুছে পরিষ্কার করে রেখে যায়। পুলিশের কিছুই করার থাকে না।

চা বোর্নভিটা খাবারদাবার সব এক সময় ফুরিয়ে গেল, তবু কারো মুখে কথা নেই, সবারই গালে হাত। কমলেশ রায় হাসলেন, 'কী ব্যাপার, তোমাদের যে কথা বন্ধ হয়ে গেল! আর এক্ষুনি কিছু বলতে হবে না, পরে, আজ হোক কাল হোক আমাকে টেলিফোন করে জানালেই হবে। আপাতত ধাঁধা রইল আর তোমরা রইলে, আমি চলি।'

বাবুয়া বলল, 'নিজের চোখে আমরা কুটোটিও দেখতে পেলাম না। এ অবস্থায় কিছু অনুমান করা খুব শক্ত, কাকাবাবু।'

কমলেশ রায় হাসলেন, 'তোমরা শুধু তোমাদের মতো বলবে। তোমাদের অনুমান আর কল্পনার ওপরে অপরাধী সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হতে যাচ্ছে না। সুতরাং তোমাদের কোনো দায়দায়িত্ব থাকছে না। আর কুটোটিও দেখতে পেলে না, এমন হতে পারে না। দুটো কুটো তোমাদের দেখাচ্ছি' পকেট থেকে একটা তোবড়ানো-দুমড়ানো চিঠির কাগজ আর একটি প্ল্যাটফর্ম টিকিট বের করে ওদের সামনে ধরলেন। ওঁরা সেই ঝুঁকে পড়ে দেখল। ওদের দেখা হয়ে গেলে কমলেশকাকা সে দুটো পকেটে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বিদায় নিয়ে দরজা পর্যন্ত গেছেন এমন সময় সুনন্দ বলল, 'কমলেশকাকা, পিছু ডাকলাম, একটু দাঁড়িয়ে যান। আচ্ছা কাকাবাবু, দুর্গাপুরে কী রকম লোডশেডিং হচ্ছে আজকাল?'

ভুরু কুঁচকে কমলেশবাবু বললেন, তোমাদের এই কলকাতার মতো নয়, ওখানে দিনক্ষণ আগে থেকে স্থির করা থাকে। ঝপ করে আচমকা ড্রপ সিন পড়ে না।'

'কাল যখন সতীকান্তবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলেন তখন নিশ্চয় লোডশেডিং চলছিল?"

'হ্যাঁ, তুমি কী করে জানলে?'

'সমস্ত বাড়িময় আলো পাখা এবং ভেতরের ঘরে টেপ রেকর্ডার

চলছিল শুনে আমার সন্দেহ হল।'

'হুঁ। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তুমি আরও কিছু সন্দেহ করেছ। নির্ভয়ে বলতে পারো।'

'আমার কয়েকটা জায়গায় খটকা লেগেছে।' মাথা চুলকে সুনন্দ বলল,'ব্রজেনবাবুর পকেটে এই গ্রীষ্মের দিনেও একখানা রুমাল, যা প্রায় জরুরি ছিল, পাওয়া গেল না কেন? প্ল্যাটফর্ম টিকেট মানিব্যাগের মধ্যে কেন? দরজার চাবি আর ওই চিঠিটাও কিন্তু ব্রজেনবাবুর পকেটে থাকবার কথা নয়। তিনি তো প্রায় তখনই বাড়ি ফিরেছেন। গেঞ্জিটা তিনি খুলছিলেন না পরছিলেন আমার খুব সন্দেহ আছে। আর যে চিঠিটা টেবিলে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল সেটাই ওঁর পকেটে পাওয়া ড্যালাপাকানো অবস্থায় পাওয়া এই চিঠি নিশ্চয়ই নয়।'

'কী করে বুঝলে?'

'এই চিঠিটা লিখে সঙ্গে সঙ্গে ড্যালাপাকানো হয়েছিল, কালি শুকোবার সময় পায়নি। চিঠিতে কী রকম কালির ছোপ লেগেছে দেখতে পাবেন।'

'বুঝেছি। তুমি বলতে চাইছ সতীকান্তই খুনি? সেই দ্বিতীয়বার আমাদের সামনে আগের চিঠির বয়ান মুখস্থ লিখে গিয়েছিল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে নিজের পকেটে পুরে নিয়েছিল। আমরা প্রথম যখন ওখানে গিয়েছিলাম, তুমি বলতে চাও, তখনই ব্রজেন ভেতরের ঘরে খুন হয়ে পড়ে ছিল?'

'হ্যাঁ।' সুনন্দ বলল, 'আর খুনের কারণ বোধহয় লটারির ফার্স্ট প্রাইজ বা ওই রকম কিছু। টিকিটটা সতীকান্ত আগেই সরিয়ে ফেলেছিল।'